pproved by the Central Text-Book Committee for Standards V & VI.

scribed by the Hon'ble Director of Public Instruction, Bengal, as the Vernacular Literary Reader for the Middle Scholarship Examination, 1918, in Burdwan and Presidency Divisions.

Vide Calcutta Gazette, Sept. 27, 1916.

সাহিত্য-সন্দর্ভ।

(পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের জন্য)

"প্রকৃতি পরিচয়", "বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার", "বৈজ্ঞানিকী", "প্রাকৃতিকী", "গ্রহ-নক্ষত্র" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা
এবং বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক

শ্রীজগদানন্দ রায়-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক
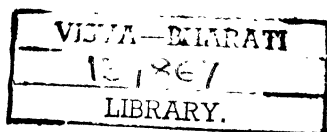
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, এলাহাবাদ।

ও

ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

১৯১৭

মূল্য ।৶০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান

১। ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্

২২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

২। ইণ্ডিয়ান্ প্রেস—এলাহাবাদ।

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস হইতে
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রথমার্দ্ধ।

	বিষয়।			পৃষ্ঠা।
১।	ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া (শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়)			১
২।	অদ্ভুত আতিথেয়তা	...	...	১১
৩।	ভিক্টোরিয়া-ক্রস্	...	...	১৮
৪।	লর্ড্ উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক্ (শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়)			২৭
৫।	প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা	ঐ	...	৩১
৬।	জগদীশ তর্কালঙ্কার	...	...	৩৫
৭।	সার্ সইয়্যদ্ আহমদ্	...	...	৩৯
৮।	বাবর (শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়)		...	৪৯
৯।	অধ্যবসায়ী আনন্দমোহন	...	...	৫৮
১০।	উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীর আত্মরক্ষা		...	৬৬
১১।	বাদুড় ...	...	...	৭৪
১২।	জীবন-সঙ্গীত (৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)		...	৮১
১৩।	রাজার রাজা (শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ)		...	৮৪
১৪।	অপূর্ব্ব গুরুভক্তি (মহাভারত—কাশীরাম দাস)		...	৮৬
১৫।	স্পর্শমণি (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)		...	৯১
১৬।	অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা (ভারতচন্দ্র)		...	৯৪
১৭।	শরতের বঙ্গ (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)		...	৯৯
১৮।	রসাল ও স্বর্ণলতিকা (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)		...	১০৩
১৯।	বৃথা বস্তু (৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার) ...		...	১০৬

দ্বিতীয়ার্দ্ধ।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	অশোক (শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়) ...	১০৭
২।	সোরাব্ ও রোস্তম্	১১২
৩।	জেনেরল্ বুথ্	১১৮
৪।	কৌশলে উপদেশ	১২২
৫।	আব্দুল গণি সাহেব বাহাদুর	১২৯
৬।	ভারতের ডাক বিভাগ	১৩৪
৭।	আকবর	১৪১
৮।	কৃতজ্ঞতা	১৪৪
৯।	রাজপুত্র দুষ্টকুমারের কথা	১৫১
১০।	অজন্তার গুহা	১৫৪
১১।	প্রকৃতির সম্মার্জ্জকবর্গ	১৬৫
১২।	ব্যাঘ্র	১৭২
১৩।	প্রার্থনা (৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)	১৮৩
১৪।	মাতৃদেবী	১৮৪
১৫।	প্রতিনিধি (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ...	১৮৬
১৬।	মৃত্যুর প্রতি ধার্ম্মিকের উক্তি (৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)	১৯১
১৭।	প্রকৃতির শোভা (৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার) ...	১৯৩
১৮।	সালেহ রাজার কথা (শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী)	১৯৯
১৯।	দশরথের প্রতি কেকয়ী (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)	২০২

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।

সাহিত্য-সন্দর্ভ।

প্রথমার্দ্ধ।

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।

ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার তুল্য পুণ্যবতী রমণী পৃথিবীতে অত্যল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনুকূল দৈববলে তিনি যেমন ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজাসন লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি সত্যে ও ধর্ম্মে অবিচলিত অনুরাগ হেতু আদর্শ নারীজীবন-লাভেও সমর্থা হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে দৈব ও পুরুষকারের অপূর্ব্ব সম্মিলন দৃষ্ট হইয়াছিল।

জীবনে সাফল্যলাভের আকাঙ্ক্ষা কাহার না থাকে? কিন্তু যথোচিত উদ্যম ও সাধুসঙ্কল্পের অভাবে অধিকাংশ ব্যক্তিই সর্ব্বজনবাঞ্ছিত গৌরবলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। ভাগ্যবতী ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে শৈশবেই এমন একটি অনন্যসুলভ দৃঢ়তা প্রকটিত হইয়াছিল যে, তাহারই

প্রেরণায় তিনি বলিতে পারিতেন, "আমাকে ভাল হইতেই হইবে।"

ভিক্টোরিয়ার পিতা ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জ্জের পুত্র এবং তাঁহার মাতা সেক্‌সকোবার্গের রাজকুমারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাজকোষ হইতে পর্য্যাপ্ত বৃত্তি পাইতেন না, এইজন্য তাঁহাদিগকে সততই নানা অভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে হইত। ভিক্টোরিয়ার বয়স যখন নয় মাস মাত্র, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সংসারে তাঁহার যে একটু শান্তি ছিল, এই শোচনীয় ঘটনায় তাহারও অবসান হইয়া যায়। শোক-দুঃখের তীব্র জ্বালা সহ্য করিয়া শৈশবে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, বোধ হয় ভিক্টোরিয়ার চরিত্র অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় এমন সমুজ্জ্বল হইয়াছিল।

ভিক্টোরিয়ার মাতা লুইসা অশেষগুণসম্পন্না রমণী ছিলেন। তিনি কখনই দুহিতাকে ধাত্রীহস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। কন্যার ক্রীড়া, ভোজন, ভ্রমণ, বেশবিন্যাস প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেরই ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন এবং বিলাসের আড়ম্বর হইতে দূরে রাখিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে দুহিতাকে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বিভূষিতা করিবার জন্য যত্নবতী হইতেন। শরীর বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু করিবার নিমিত্ত ভিক্টোরিয়াকে প্রতিদিন নিয়মিত ব্যায়াম এবং পুষ্পোদ্যানে জলসেচন করিতে হইত।

ভিক্টোরিয়া যে, এককালে ইংলণ্ডের গৌরবময়

সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন, দেশের সমস্ত লোকই তাহা জানিত। কিন্তু মাতা লুইসা ইহার কথা কন্যার নিকটে অনেক দিন অপ্রকাশ রাখিয়াছিলেন। বালিকা ভিক্টোরিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎসৌভাগ্যের কথা জানিয়া, পাছে চঞ্চল হইয়া পড়েন এবং অযথা গর্ব্ব অনুভব করেন, স্নেহময়ী মাতার মনে সর্ব্বদা এই আশঙ্কা হইত। ভিক্টোরিয়া বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাঁহার শিক্ষয়িত্রী একদিন ইংলণ্ডের ইতিবৃত্তে লিখিত রাজগণের তালিকাখানি তাঁহার ছাত্রীর সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলেন। তালিকার অধোভাগে ভাবী রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নাম মুদ্রিত ছিল। বালিকা ভিক্টোরিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "ইংলণ্ডের সিংহাসন যে আমার ভাগ্যে এত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, এতদিন আমি তাহা জানিতাম না" শিক্ষয়িত্রী বলিয়াছিলেন, "এই সংবাদ এতদিন তোমাকে জ্ঞাপন করা উচিত বলিয়া মনে করি নাই, অতঃপর সিংহাসন তোমারই প্রাপ্য।" শিক্ষয়িত্রীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভিক্টোরিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ধীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "রাণী হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া যাহারা গর্ব্বিতা হয়, তাহারা এই পদের গুরুত্ব সম্যক্ অবগত নহে।" এই বলিয়া তিনি শিক্ষয়িত্রীর করধারণ-পূর্ব্বক দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমাকে ভাল হইতেই হইবে; এত দিনে বুঝিলাম, আমার মাতা এবং আপনি সুশিক্ষা দিবার জন্য কেন এত আগ্রহ প্রকাশ

করিতেন।” শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, “বর্ত্তমান রাজার যদি এখনও কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই সন্তানই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে।” কিন্তু বালিকা ভিক্টোরিয়া ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, “আমি তাহাতে অণুমাত্র দুঃখিতা হইব না, রাজা আমাকে প্রচুর স্নেহ করেন।” বালিকার এইপ্রকার সরলতা তাঁহার শৈশবের সুশিক্ষা দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল।

ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে ভিক্টোরিয়াকে লইয়া মাতা প্রত্যহ গৃহে উপাসনা করিতেন এবং প্রতি-রবিবারে ভজনালয়ে ঈশ্বরারাধনায় যোগদান করিতে কদাচ বিস্মৃত হইতেন না। ভিক্টোরিয়া গভীর অভিনিবেশসহকারে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন। একদিন ভজনালয়ের উপাসনাকালে একটি বোল্‌তা বালিকার মুখের সমীপে অবিরাম ঘুরিতেছিল। ঐ বোল্‌তা পাছে তাঁহাকে দংশন করে, এই আশঙ্কায় সমীপবর্ত্তী সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু একাগ্রতা-হেতু ভিক্টোরিয়া বোল্‌তার আগমন-সম্বন্ধে কিছুই উপাসনার শেষপর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০এ জুন ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বে কেন্‌সিংটন প্রাসাদের সম্মুখে একখানি দ্রুতগামী শকট আসিয়া উপস্থিত হইল। শকট দণ্ডায়মান হইবামাত্র ইংলণ্ডের প্রধান

পুরোহিত এবং লর্ড্ চেম্বার্‌লেন তাহা হইতে অবতরণ করিলেন। তখন প্রাসাদের সকলেই সুখসুপ্ত। নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য আগন্তুকদ্বয় পুনঃপুনঃ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুপ্তোত্থিত এক ভৃত্য তাঁহাদিগকে একটি প্রকোষ্ঠে বসিবার আসন প্রদান করিল। কিয়ৎকাল উপবেশনের পরে কাহারও দেখা না পাইয়া তাঁহারা ব্যস্ততার সহিত ঘণ্টাবাদন করিতে লাগিলেন। ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরিচারিকা সেস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"রাজকুমারী গভীর নিদ্রায় নিমগ্না আছেন, এমন সময়ে কেহ তাঁহার সুখ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিতে অভিলাষী নহে।" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা রাজকার্য্যে ইংলণ্ডের রাণীর নিকটে আসিয়াছি, রাণীকে জাগরিত করিতেই হইবে। পরিচারিকা আনন্দে বিহ্বল হইয়া রাজকুমারীর নিকটে প্রস্থান করিল।

নিদ্রাভঙ্গে ভিক্টোরিয়া সহসা পিতৃব্যের মৃত্যু ও আপন সিংহাসনপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার আর নৈশ বাস পরিত্যাগ করিবার অবসর হইল না, তিনি একখানি শাল গাত্রে জড়াইয়া মুক্তকেশে, অশ্রুপূর্ণলোচনে আগন্তুকগণের সহিত দেখা করিতে চাহিলেন। প্রধান পুরোহিতের মুখে রাজার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র তিনি বলিলেন, "আপনি আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।" তাঁহারা তিনজনে তৎক্ষণাৎ নতজানু হইয়া পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে

ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে ভিক্টোরিয়ার পুণ্য রাজত্বের শুভ সূত্রপাত হইল।

উপাসনান্তে তিনি তাঁহার পিতৃব্যপত্নীকে সান্ত্বনাসূচক পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের শিরোনামায় "মহারাণী" শব্দের উল্লেখ ছিল বলিয়া পার্শ্বস্থিত কোন ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, চতুর্থ উইলিয়মের পত্নী এক্ষণে আর মহারাণী নহেন। নবীনা মহারাণী উত্তরে বলিলেন, "আমি তাহা অবগত আছি, আমিই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে ঐ অবস্থান্তরের সংবাদ জানাইতে ইচ্ছা করি না।" সেইদিন বেলা একাদশ ঘটিকার সময়ে যথাবিধি রাজদরবারে তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। রাজত্বলাভের পরে মহারাণী প্রত্যহ অনলসভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা এবং সরকারী কাগজপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া অপ্রমেয় প্রভুত্ব ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও বিন্দুমাত্র গর্ব্বিতা ছিলেন না। তিনি স্থিরভাবে ধর্ম্মপথে থাকিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের ২৮এ তারিখে মহারাণীর রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া যথারীতি মহাসমারোহে সম্পাদিত হইল। সেদিন সর্ব্বদিক্ হইতে সংখ্যাতীত ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিল, "ঈশ্বর আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে দীর্ঘায়ু করুন। অভিষেক-উপলক্ষ্যে সপ্তাহকাল লক্ষ লক্ষ ধনী ও দরিদ্র প্রচুর আহার পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।

এই উপলক্ষ্যে রাজকোষ হইতে প্রায় নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পারিবারিক জীবনও সুখময় ছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ডিউক্ আর্‌নেষ্টের কনিষ্ঠ পুত্র এল্‌বার্টের সহিত তাঁহার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। স্বামীর প্রতি মহারাণীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। কোন বন্ধুকে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "এলবার্টের তুল্য পবিত্রস্বভাব, প্রীতিভাজন ও সদাশয় ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নাই।" তাঁহার এই উক্তি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বামীর প্রতি তাঁহার কিরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। স্বামীর সন্তোষবিধান তিনি তাঁহার জীবনের পবিত্র ব্রত বলিয়া জানিতেন। তিনি কখন কখন দুঃখ করিয়া বলিতেন, "এল্‌বার্ট আমারই জন্য জনকজননী, ভ্রাতা-ভগিনী পরিত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়াছেন; ঈশ্বরের কৃপায় আমি যেন তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে পারি।" মহারাণীকে আনন্দপ্রদান এল্‌বার্টও তাঁহার জীবনের সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতেন। পরস্পরের প্রতি এইরূপ অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁহাদের গার্হস্থজীবন সুখময় করিয়াছিল। তাঁহারা একে একে পাঁচ কন্যা ও চারি পুত্র লাভ করেন। জনকজননীর পুণ্যচরিত্র-প্রভাবে পুত্রকন্যাগণও জ্ঞানে এবং চরিত্রে উন্নত হইয়াছিলেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি যখন যুবরাজ

ছিলেন, তখন জননী ভিক্টোরিয়ার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া একবার ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। মাতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এড্‌ওয়ার্ড বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরের নিকটে আমার এই প্রার্থনা, আমি যেন প্রজা-সমূহের মঙ্গল সাধন করিতে পারি।" এই এড্‌ওয়ার্ডের পুত্র এবং পুণ্যবতী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র পঞ্চম জর্জ্জ এক্ষণে আমাদের সম্রাট্। তিনিও দুইবার ভারতবর্ষে আসিয়াছেন এবং ভারতীয় প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার স্নেহের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রদ্ধাশীল ও গুণবান্ সন্তানলাভে ভিক্টোরিয়ার সংসার আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল।

মহারাণীর অমায়িকতা ও সুজনতাসম্বন্ধে বহু আখ্যান প্রচলিত আছে। এক দরিদ্র ধর্ম্মযাজকের কন্যা মহারাণীর পুত্রকন্যাদিগের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষয়িত্রীর জননী ব্যাধিগ্রস্তা হইলে, তিনি কার্য্য ত্যাগ করিয়া জননীর সেবার নিমিত্ত গৃহে গমন করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। তখন মহারাণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি গৃহে গমন করিয়া যতদিন আবশ্যক তোমার জননীর পরিচর্য্যা কর, তোমাকে কার্য্য ত্যাগ করিতে হইবে না, তোমার অনুপস্থিতিকালে এল্‌বার্ট ও আমি তোমার পরিবর্ত্তে কার্য্য করিব।"

দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের অভাবের কথা শুনিলে মহারাণীর স্নেহপ্রবণ হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়া পড়িত। ভারতবর্ষের

প্রজাদিগকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন; এই দেশের দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূকম্পন প্রভৃতি দৈব উৎপাতের সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি বহুবার গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তখন দয়াবতী মহারাণী নিজে অন্নক্লিষ্টদিগকে দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

ক্রিমিয়াযুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের দুঃখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে অর্থসাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, রাত্রি জাগরণ করিয়া স্বয়ং তাহাদিগের জন্য বস্ত্র সীবন করিতেন।

মানবমাত্রকেই দুঃখের তীব্র আঘাত সহ্য করিতে হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুণ্যবতী জননীকে হারাইয়া গভীর শোক প্রাপ্ত হইলেন। এই শোক অপগত হইতে না হইতেই সেই বৎসরে তাঁহার স্বামী এল্‌বার্ট মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। স্বামীর অভাবে মহারাণীর হৃদয় শোকে এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল কোনপ্রকার আমোদে যোগদান করিতে পারেন নাই।

সিপাহী-বিদ্রোহের পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে আপন হস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ করেন। তখন দিল্লীনগরে এক বিরাট দরবারের অধিবেশন হইয়াছিল। এই

সময়ে ভারতীয় ভূপতিবর্গ মহারাণীকে আশ্রয়দাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর রাজত্বের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হয়। ঐ সময়ে সমগ্র পৃথিবী "জুবিলী" উৎসবের আনন্দে মুখরিতা হইয়াছিল। অতঃপর দশ বৎসর পরে তাঁহার রাজত্বের ষষ্টি বৎসর পূর্ণ হইলে বিপুল আড়ম্বরে "হীরক জুবিলী" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জকে মহারাণী আন্তরিক স্নেহ করিতেন। এই দেশের লোকদিগের সহিত দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করিবার জন্য তিনি বৃদ্ধবয়সে উর্দ্দূভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২২এ জানুয়ারী এই পুণ্যবতী রমণী নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র পৃথিবী শোকে অধীর হইয়াছিল। অনন্যসুলভ সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও জ্ঞানানুরাগে একদিকে তিনি যেমন আদর্শ রমণীকুলের শিরোমণি ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি প্রজানুরাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় তাঁহাকে পৃথিবীর ভূপতিবর্গের বরণীয় করিয়াছিল। এইজন্যই যাঁহারা কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই, এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুতে মাতৃহীনের ন্যায় বিলাপ করিয়াছিলেন।

প্রশ্নাবলী।

১। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একাগ্রতা-সূচক ঘটনার উল্লেখ কর এবং তাঁহার প্রজাবাৎসল্য ও করুণার উদাহরণ দাও।

২। অনন্তসুলভ, সুপ্তোত্থিত, গুণসম্পন্না, ধ্যানমগ্না,—এগুলির ব্যাসবাক্য বল।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বিশেষণে পরিবর্ত্তিত কর :—শ্রবণ, বিনয়, অধ্যাপনা, অনুরাগ।

৪। মুক্তকেশ, ভগবান্, আশ্রয়দাতা,—এই শব্দগুলির স্ত্রীলিঙ্গে কি হইবে বল ?

অদ্ভুত আতিথেয়তা।

অতিপ্রাচীনকালে আরবদেশে হাতেম-তাই নামে এক বিখ্যাত ব্যক্তি বাস করিতেন। বিদ্যায়, জ্ঞানে ও বদান্যতায় তৎকালে তথায় তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। তাঁহার দানশীলতার কথা শ্রবণ করিয়া নানা দেশ হইতে বহু দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তি আসিয়া অভাব জ্ঞাপন করিত এবং হাতেমও যথাশক্তি তাহাদের অভাব মোচন করিতেন। পরের দুঃখ-মোচনের জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন ; প্রার্থীর নিকটে তাঁহার অদেয় কিছুই ছিল না।

হাতেম-তাইয়ের দুলদুল্ নামে একটি বৃহৎ অশ্ব ছিল। হাতেমের সুযশের সহিত এই অশ্বের গুণগ্রাম দেশবিদেশে

প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার ন্যায় সুলক্ষণাক্রান্ত সুশ্রী সুশিক্ষিত ও তেজস্বী অশ্ব সমগ্র আরবদেশ অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া যাইত না। তাহার মেঘের ন্যায় স্নিগ্ধশ্যামল মূর্ত্তি ও বজ্রগম্ভীর হ্রেষা যুদ্ধকালে শত্রুর হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিত এবং তাহার পবনবিজয়িনী গতি অতি-সঙ্কটকালেও হাতেমকে বিপন্মুক্ত করিত। মৃগয়া-কালে অশ্ববর দুল্‌দুল্ হাতেমের প্রধান সহায় ছিল। হিংস্র বন্যজন্তুর আকস্মিক আক্রমণ হইতে এই অশ্ব যে, কতবার তাঁহার আসন্ন মৃত্যু নিবারণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে পথভ্রান্ত হইয়া হাতেম-তাই অনেকবার মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, দুল্‌দুল্ শীতল বালুকারাশির উপরে শয়ন করিয়াছে এবং হাতেম তাহারই কোমলস্পর্শ রোমশ দেহে মস্তকস্থাপন-পূর্ব্বক সুখে ও নির্ভয়ে রাত্রি যাপন করিয়াছেন। মরুভূমির মধ্যে মৃগয়া-কালে হাতেম আতপ-ক্লিষ্ট হইলে, দুল্‌দুল্ স্থিরভাবে দাঁড়াইত এবং হাতেম তাঁহার এই প্রিয় অশ্বের ছায়ায় উপবেশন করিয়া বিগতক্লম হইতেন।

এই অশ্বের গুণগ্রামের কথা একদা তুরস্কের সুলতানের কর্ণগোচর হইল। তিনি পূর্ব্বেই হাতেম-তাইয়ের অলৌকিক দানশীলতার কাহিনী শুনিয়াছিলেন এবং প্রার্থীর প্রার্থনা-পূরণের জন্য যে, হাতেম্ সর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন, এই কথাও তাঁহার জানা ছিল। হাতেম-তাই প্রকৃতই দানশীল

কি না, স্বয়ং পরীক্ষা করিবার জন্য সুলতানের কৌতূহল হইল। তিনি মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন, যেন অবিলম্বে কয়েকজন দূতকে সুসজ্জিত করিয়া হাতেমের নিকটে প্রেরণ করা হয়। দূতগণ হাতেম-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সেই সুপ্রসিদ্ধ দুলদুল্‌কে গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিবে। এই প্রার্থনার কথা শুনিয়া যদি হাতেম প্রফুল্ল-অন্তঃকরণে তাঁহার সেই আদরের ধন এবং পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর অশ্বটিকে দান করেন, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, তিনি প্রকৃতই দাতা।

সুলতানের আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র, দূতগণ বহু সুসজ্জিত রক্ষকে পরিবৃত হইয়া ঘোটক প্রার্থনা করিবার জন্য হাতেম-তাইয়ের নিকটে যাত্রা করিলেন। বহু গ্রাম নগর, দুস্তর নদ নদী, শৈলসঙ্কুল পথ ও মরুভূমি অতিক্রম করিয়া একদিন নিশাকালে সম্রাড়্‌দূতগণ ক্লান্তদেহে হাতেম-তাইয়ের আবাস-নগরে উপনীত হইলেন। তখন বর্ষাকাল; সপ্তাহব্যাপী অবিরাম বর্ষণে নগর প্রায় জলমগ্ন; প্লাবনক্লিষ্ট জানপদবর্গের আর্ত্তনাদ ও বারিপাতের ভীষণ শব্দ ব্যতীত নগরে আর কোন কোলাহল নাই। ধনী ও নির্ধন সকলেরই অন্নকষ্ট উপস্থিত। দেশান্তর হইতে যে, আহার্য্য সংগ্রহ করা যাইবে তাহারও উপায় নাই; মহাপ্লাবনে স্থানান্তরে গমনাগমন একবারে অসম্ভব। হাতেম-তাইয়ের আদেশ ছিল, নগরে কোন দিন কেহ অনাহারে থাকিবে না।

প্রতিদিনই তাঁহার অতিথিশালায় সহস্র সহস্র নিরন্ন ব্যক্তি বহুবিধ উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইত; কিন্তু প্লাবনে হাতেমের অতিথিশালাও রুদ্ধ,—লক্ষ লক্ষ নিরন্ন নরনারীকে আহার্য্য দান করায় তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া গিয়াছে।

পথিমধ্যে বহুক্লেশ ভোগ করিয়া সম্রাটের দূত রক্ষিগণের সহিত রাত্রি দ্বিপ্রহরে হাতেম-তাইয়ের ভবনে উপনীত হইলেন। তুরস্কের সম্রাটের নিকট হইতে দূতের আগমন হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, হাতেম স্বয়ং অতিথিগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং সম্রাটের দূত বলিয়া বহুমূল্য বসনভূষণ এবং সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিয়া তাঁহাদের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন। কতিপয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ তাঁহাদের বাসগৃহরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজদূতগণের অভ্যর্থনা শেষ হইলে, তাঁহাদিগের সম্মুখে কি আহার্য্য উপস্থিত করা হইবে, ইহা ভাবিয়া হাতেম আকুল হইয়া পড়িলেন। সহস্র সহস্র নগরবাসী ও তাহাদের শিশু-সন্তানগুলি ঘোর জলপ্লাবনের দিনে অনাহারে আছে ভাবিয়া, তিনিও সমস্ত দিন উপবাসী ছিলেন। ভাণ্ডার অনুসন্ধান করিয়া কোনও সুখাদ্য পাওয়া গেল না; প্লাবন-পীড়িত বিপন্ন নাগরিকদিগের দুর্গতিমোচনের জন্য হাতেম সমস্ত দিন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন; এক্ষণে অভ্যাগতগণকে যাহাতে রাজোচিত অন্নপানাদি দিয়া সৎকার করিতে

পারেন, তজ্জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ভোজনকাল উপস্থিত হইল। হাতেম রাজদূতগণকে সমাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের ভোজন-পাত্রে সুগন্ধি পলান্ন ও বহুবিধ সরস ব্যঞ্জনাদি স্বয়ং পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। পথশ্রমে কাতর এবং ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত অতিথিগণ সুস্বাদু ভোজ্য পাইয়া পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। অতিথিদিগকে পরিতৃপ্ত দেখিয়া হাতেম কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহার কাতর প্রার্থনায় যে, পরমপিতা পরমেশ্বর এই দুর্দ্দিনেও অতিথি-সৎকারের যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া দিলেন, তজ্জন্য হাতেম কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকে শত শত প্রণাম করিলেন। কিন্তু এত আহার্য্য প্রস্তুত থাকিতেও তিনি বিন্দুমাত্র জলগ্রহণ করিলেন না।

রজনী প্রভাত হইল। সেদিনও পূর্ব্বের ন্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; বৃষ্টিরও বিরাম নাই; মধ্যে মধ্যে অশনি-পাতের কঠোর ধ্বনি সর্ব্বস্বান্ত নাগরিকগণের বিহ্বল হৃদয়ে নূতন আশঙ্কার সৃষ্টি করিতেছিল। সম্রাটের দূতগণ হাতেম-তাইয়ের নিকটে নিবেদন করিলেন, "আপনার বদান্যতা ও আতিথেয়তার কথা আমরা দূর হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, গত রজনীতে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। অতিথিসেবার এতাদৃশ আয়োজন কেবল আপনারই ন্যায় ভুবন-বিশ্রুত দাতার পক্ষে সম্ভবপর। সম্রাটের যে আদেশ বহন করিয়া

আমরা আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে তাহা নিবেদন করি। দুল্‌দুল্ নামে আপনার যে সুশ্রী সুশিক্ষিত অশ্বের গুণগ্রাম দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছে, তুরস্কের মহামহিম-সুলতান সেই তুরঙ্গম দানস্বরূপে পাইবার জন্য আপনার নিকটে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। কোনও দ্রব্য যাচ্ঞা করিয়া কেহই আপনার দ্বার হইতে রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই; সম্রাট্‌কে আপনার দুল্‌দুল্ দান করিয়া, দাতা নাম সার্থক করুন।”

হাতেম-তাই অবনতমস্তকে দূতগণের বাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন এবং মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুবিন্দু তাঁহার ক্রোড়ে পতিত হইতেছিল। ক্ষণকাল নির্বাক্ থাকিয়া বাষ্প-গদ্‌গদ্-কণ্ঠে হাতেম বলিলেন, “সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য হইল। গত রাত্রিতে আপনাদের আগমনকালে সম্রাটের আদেশ জানিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ দুল্‌দুল্‌কে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার পরম-সম্পদ্ জীবনের সখা পুত্রাধিক প্রিয়তর দুল্‌দুল্‌কে গত রজনীতে বধ করিয়াছি। কয়েক দিন বহু নিঃস্ব নগরবাসীকে আহার্য্য-প্রদানে আমার ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছিল; বহু ক্লেশে কয়েক মুষ্টি তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করিয়া দুল্‌দুলের মাংসে আপনাদের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছি।” এই বলিয়া হাতেম-তাই নীরব হইলেন।

হাতেমের এই হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া

দূতগণ হতবুদ্ধি হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহাদেরও বসন অশ্রুসিক্ত হইতে লাগিল। ইহার পরে কখন তাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরের বৃষ্টিবাত্যার মধ্যে চলিয়া গেলেন, বিহ্বল হাতেম তাহা জানিতে পারিলেন না।

দূতগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই অপূর্ব্ব আতিথেয়তার বিবরণ নিবেদন করিলে, সম্রাট্ মর্ম্মাহত হইয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "আমিই এই অনর্থের মূল। যদি কেহ দুল্‌দুলের প্রাণদান করিতে পারে, তাহা হইলে আমি আমার এই অখণ্ড সাম্রাজ্য তাহাকে দান করিতে প্রস্তুত আছি।"

বলা বাহুল্য, দুল্‌দুল্ প্রাণ পাইল না, কিন্তু হাতেম-তাই এই কার্য্যে যে মহাপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহার স্মৃতি অক্ষয় হইয়া রহিল।

প্রশ্নাবলী।

১। তুরস্কের সম্রাট্ দুল্‌দুল্ অশ্ব লইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা দূত-মুখে শুনিয়া কেন হাতেম-তাই ক্রন্দন করিয়াছিলেন এবং দুল্‌দুল্‌কে বধ করা হইয়াছে শুনিয়া, কেন দূতগণ ক্রন্দন করিয়াছিলেন?

২। বর্ত্তমান পাঠের গল্পাংশ সংক্ষেপে নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর এবং নদীর বা বৃষ্টির জলে নগর বা গ্রাম প্লাবিত হইলে, তুমি নিজে যে দৃশ্য দেখিয়াছ তাহা বর্ণনা কর।

৩। ব্যাস-বাক্য বল :—মর্ম্মাহত, ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত, পবনবিজয়িনী।

৪। "নির্ধনী" ও "নির্ধন" এই দুই শব্দের মধ্যে কোন্‌টি অশুদ্ধ? —কেন?

ভিক্টোরিয়া ক্রস্।

(পরার্থপরতা ও সাহসিকতার পুরস্কার)

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়া-মহাসমরে ইংরাজগণ জয়লাভ করিলে, আমাদের পরলোকগত মহারাণী ভিক্টোরিয়া বিজয়ী বীরগণকে নানাপ্রকারে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। কেহ উচ্চতর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, কেহ বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও তরবারি উপহার পাইয়াছিলেন এবং কেহ দুর্লভ রাজোপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। রাজ্যের সুসন্তানগণকে এইপ্রকারে পুরস্কৃত করিয়াও মহারাণী সন্তোষ লাভ করেন নাই; ইংরাজ-সৈনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা আসন্ন মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অসমসাহসিকতা ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ং বিশেষভাবে সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "ভিক্টোরিয়া ক্রস্"-নামক সম্মানসূচক পদক এই সময়ে মহারাণীর ইচ্ছায় প্রথম প্রদত্ত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা স্বর্ণ, রৌপ্য বা অপর কোন বহুমূল্য ধাতু দিয়া প্রস্তুত নহে, স্বল্প মূল্যের পিত্তলই ইহার উপাদান; তথাপি সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র পদাতিকপর্য্যন্ত সকলেই এই পদকলাভের আশায়

লালায়িত থাকেন। যে সকল আত্মত্যাগী সাহসী বীর ভিক্টোরিয়া ক্রস্ লাভ করিয়াছেন, রাজসভায় এবং জন-

ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পদক।
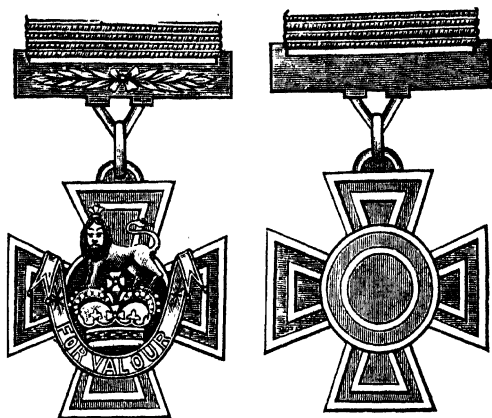
সাধারণের নিকটে তাঁহারা মুকুটধারী রাজাধিরাজ অপেক্ষা অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। আমরা বর্ত্তমান পাঠে এই পদকপ্রাপ্ত কয়েকটি স্বার্থত্যাগী মহাপ্রাণ ব্যক্তির কীর্ত্তি আলোচনা করিব।

(১)

ভুবনবিশ্রুত মহাবীর এবং ভারতের ভূতপূর্ব্ব সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড রবার্ট্‌স্ যখন সামান্য সৈনিককর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তাহার পঞ্চ বৎসর পরেই সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। তখন রবার্ট্‌স্ লেফ্‌টেনাণ্টের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

যে সকল বিপথগামী মূঢ় সিপাহী প্রতাপান্বিত ইংরাজ-রাজের এবং জনসাধারণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে একদল লক্ষ্ণৌ নগর অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ইংরাজ-রাজের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং দুই দল সৈন্য বিদ্রোহীদিগের পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক খোদাগঞ্জনামক স্থানে উপনীত হইল। রবার্ট্‌স্‌ এই সৈন্যদলের অন্তর্ভূত ছিলেন। বিদ্রোহীরা পূর্ব্বোক্ত স্থানে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল এবং অচিরাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ইংরাজ-সৈন্যদের চালক রণক্ষেত্রে আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন এবং কয়েকজন অশ্বারোহী শিখসৈন্য শত্রুগণকর্ত্তৃক এপ্রকারে বেষ্টিত হইয়া পড়িল যে, সিপাহীদিগের হস্ত হইতে তাহাদেরও মুক্তির উপায় রহিল না।

রবার্ট্‌স্‌ উক্ত দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, মৃত্যুভয় ত্যাগ করিয়া নগ্ন তরবারি হস্তে বিপন্ন সৈনিকগণের সাহায্যার্থে অশ্বচালনা করিলেন। কোন বীর মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও যে, পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় শত্রুর সম্মুখীন হইতে পারে, তাহা সিপাহীরা কল্পনাই করিতে পারিল না। অশ্বারোহী রবার্ট্‌স্‌কে ব্যূহ-সম্মুখীন হইতে দেখিয়া, বিদ্রোহিগণ ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে অস্ত্রাহত করিল। রবার্ট্‌স্‌ ক্ষত-বিক্ষত দেহ লইয়াও অবিরাম অসিচালনা করিতে লাগিলেন এবং তরবারির অব্যর্থ আঘাতে একে একে তিনজন বিদ্রোহীকে

লর্ড রবার্ট্‌স্

ভূমিশায়ী করিলেন। এই অদ্ভুত বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া অবশিষ্ট বিদ্রোহিগণ রবার্ট্‌সের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না; সকলেই পলায়ন করিল। যে কয়েকটি অশ্বারোহী শিখসৈন্য শত্রুবেষ্টিত হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিল, তাহারা এইপ্রকারে বিপন্মুক্ত হইল।

সিপাহী-বিদ্রোহের অবসান হইলে, পূর্ব্বোক্ত পরার্থপরতা ও সাহসিকতার জন্য রবার্ট্‌স্‌ ভিক্টোরিয়া ক্রস্‌ পুরস্কারস্বরূপে লাভ করিয়াছিলেন। রণপাণ্ডিত্য ও বীরত্বের জন্য লর্ড্‌ রবার্ট্‌স্‌ পরবর্ত্তী জীবনে যে সকল মণিকাঞ্চনময় রাজোপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কারুকার্য্যহীন পিত্তল-পদকটিই তাঁহার অতীব প্রিয় ছিল।

(২)

অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে গভীর পাথুরিয়া কয়লার খনি অতি-বিপজ্জনক স্থান ছিল। বাষ্পরাশি প্রজ্বলিত হইয়া তখন নানা অনর্থের সূত্রপাত করিত। দাহ্য বাষ্প উৎপন্ন হইলেই এখন যেমন নানা উপায়ে তাহা খনি হইতে বহির্গত করা হয়, তখন তাহার ব্যবস্থা ছিল না।

গত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে একদিন হঠাৎ ইংলণ্ডের ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড্‌ কয়লার খনিতে এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। কি প্রকারে অগ্নি উৎপন্ন হইল, জানা গেল না। সেদিন কোন কারণে সাধারণ শ্রমজীবীদিগের কার্য্য বন্ধ ছিল; কেবল দশজন শ্রমজীবী খনির গভীরতম তলদেশে কার্য্য

করিতেছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পার্শ্ববর্ত্তী নগর ও গ্রামে প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং দলে দলে লোক খনির দিকে ছুটিতে লাগিল। চারিদিকের হাহাকারের সহিত খনির ভিতরকার মেঘ-গর্জ্জনবৎ ধ্বনি মিলিত হইয়া লোকের মনে ত্রাস-সঞ্চার করিতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক্ নিবিড় ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সকলেই সেই দুর্ভাগ্য শ্রমজীবীদের জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। নিজ জীবনকে বিপন্ন করিয়া কে সেই ভূগর্ভস্থ অগ্নিরাজ্যে প্রবেশ করিবে?

খনি হইতে দুইক্রোশ দূরে স্মল্‌ম্যান্ নামক একটি যুবক এন্‌জিনিয়ার বাস করিতেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে এবং পরার্থপরতায় স্থানীয় লোক মুগ্ধ ছিলেন; বিপন্নের উদ্ধার, অনাহারক্লিষ্টের আহার-সংস্থান এবং পীড়িতের সেবা তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। তিনি নিজের ব্যবসায়ে যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশই এই সকল লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডের অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ কর্ণগোচর হইলে, তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, গ্রামবাসী দ্বাদশটি যুবকের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া খনি-গর্ভে আবদ্ধ শ্রমজীবীদিগের উদ্ধারে যাত্রা করিলেন। স্মল্‌ম্যান্ এবং তাঁহার অনুচরবর্গ যখন দুর্ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন খনি অগ্নিময়, নিম্নে যাইবার পথটিও অবরুদ্ধ; সেই পথ দিয়া জ্বলন্ত বাষ্প স্তম্ভাকারে উর্দ্ধোত্থিত হইতেছিল।

তাঁহারা খনির বায়ু-প্রবেশের পথ অবলম্বন করিয়া ভিতরে লম্ফপ্রদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই চেষ্টাও ব্যর্থ হইল; ধূম ও বাষ্পরাশি তাঁহাদিগের শ্বাসরোধ করিতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া বাষ্পাদি যাহাতে অন্য পথ দিয়া নির্গত হয়, তাঁহারা সেই ব্যবস্থায় ব্যাপৃত রহিলেন।

হঠাৎ খনি-প্রবেশের পথ ধূমহীন হইয়া গেল, অগ্নির প্রকোপও হ্রাস হইয়া আসিল। খনিতে আবদ্ধ শ্রমজীবী-দিগকে উদ্ধার করিবার ইহাই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া স্মল্‌ম্যান্ ভূগর্ভে লম্ফপ্রদানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে এক নূতন বিপদ্ দেখা দিল; অকস্মাৎ খনির প্রত্যেক প্রবেশ-পথ দিয়া দ্বিগুণবেগে ধূম ও জ্বলন্ত বাষ্প অনর্গল নির্গত হইতে লাগিল। স্মল্‌ম্যান্ তখন প্রবেশপথের নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি অগ্নির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার অবকাশ পাইলেন না, তাঁহার দেহের দক্ষিণার্দ্ধ অগ্নিদগ্ধ হইয়া গেল এবং বিপন্নের বন্ধু লোকপ্রিয় স্মল্‌ম্যানের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুল জনমণ্ডলী হাহাকার আরম্ভ করিল। স্মল্‌ম্যান্ যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী চিকিৎসালয়ে রাখা হইল।

স্মল্‌ম্যান্ যাহাদের জীবনরক্ষার জন্য নিজ জীবনও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহই অগ্নির করাল গ্রাস হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইল না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনায়

তিনি যে স্বার্থত্যাগ ও মহত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আজও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে; স্মলম্যান্ সাহেব তাঁহার সাহসিকতা ও পরার্থপরতার জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রস্ উপহার পাইয়াছিলেন।

(৩)

১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের সূত্রপাত হয়। আমাদিগের মহামহিম-সম্রাট্ ন্যায় ও সত্যের পক্ষ সমর্থন করিয়া, এই সমরে যোগদান করেন। কয়েক মাস ব্যাপিয়া জলে, স্থলে, আকাশে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারতীয় সৈন্যগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই; তাহারাও আমাদের সম্রাটের প্রতি আন্তরিক ভক্তি দেখাইবার জন্য ইংরাজ-সৈন্যের সহিত ফ্রান্সের সীমান্ত-প্রদেশে উপস্থিত হইয়া জর্ম্মান-সৈন্যদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২৬শে এপ্রিল তারিখে ফ্রান্সের পশ্চিম প্রান্তে ইংরাজসৈন্যের পশ্চাতে ভারতীয় সৈন্যগণ অবস্থান করিতেছিল। অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে শত্রুসৈন্যের সমাবেশ। উভয় সৈন্যই কামানের গোলাবৃষ্টি হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভূপৃষ্ঠে নাতিগভীর খাত খনন করিয়া অবস্থান করিতেছে। রাত্রি সমাগত হইল; সমস্ত দিনই গোলা বর্ষণ করিয়া উভয় পক্ষই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তখনও কামানের গর্জ্জন নীরব হয় নাই। মধ্যে মধ্যে অতর্কিত-ভাবে এক

একটি গোলা আসিয়া সৈন্যগণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিতেছিল। ন্যায়যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তখন বিপক্ষ সৈন্যগণ বর্ব্বরের ন্যায় বিষাক্তবাষ্পপূর্ণ গোলক ইংরাজ-সৈন্যের দিকে নিক্ষেপ করিতেছিল এবং বিষ-বায়ুতে রুদ্ধশ্বাস হইয়া অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় সৈন্য ভূশায়ী হইতেছিল। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া চেতনা-হীন সৈন্যদিগকে উঠাইয়া আনয়ন করে, এমন সাহস কাহারও ছিল না। ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া জমাদার মীরদস্ত্ এই ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; কয়েকটি অনুচরকে সঙ্গে লইয়া রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। নিজের জীবনের দিকে লক্ষ্য নাই, সম্মুখে একটি গোলা পড়িয়া বজ্র-নাদে বিদীর্ণ হইল এবং তাহার একটি অংশ গাত্রে লাগিয়া শরীর রক্তাক্ত করিল, তাহাতেও তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন না ; কিপ্রকারে অসহায় মূর্চ্ছিত সৈন্যগণকে শিবিরে আনয়ন করিবেন, তখন ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা। পরোপকারের জন্য যিনি এইপ্রকারে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃত-সঙ্কল্প, ঈশ্বরই তাঁহার সহায়। সেই গোলাবৃষ্টির মধ্যে মীরদস্ত্ দশটি হতচেতন সৈনিককে একে একে রণক্ষেত্রের চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিলেন।

পর দিবস প্রভাতে মীরদস্তের এই অদ্ভুত পরার্থপরতা ও অসাধারণ সাহসিকতার কথা শ্রবণ করিয়া, শিবিরস্থ সকলেই

বিস্মিত হইলেন। মীরদস্ত্ সেদিন কাহারও সহিত আলাপ করেন নাই। যে ঈশ্বরের কৃপায় তিনি দশটি অসহায় মানবের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারই চিন্তায় দিবস যাপন করিয়াছিলেন। জমাদার মীরদস্ত্ তাঁহার এই পরার্থপরতা ও সাহসিকতার জন্য সম্প্রতি বীরজনবাঞ্ছিত ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পদক উপহার পাইয়াছেন।

প্রশ্নাবলী।

১। লর্ড রবার্ট্স্ কে ছিলেন? তাঁহার সাহসিকতা ও পরার্থপরতার ঘটনাটি সহজ ভাষায় ব্যক্ত কর।

২। বীরজনবাঞ্ছিত, অগ্নিদগ্ধ, বাক্যালাপ, প্রতিমুহূর্ত্ত, মণিকাঞ্চনময়, এই কয়েকটি শব্দের ব্যাস-বাক্য বল এবং ইহাদের অর্থ বল।

৩। সমাবেশ, বিদীর্ণ, বহির্গত,—এই শব্দত্রয়ের ব্যুৎপত্তি কি?

৪। বিপন্মুক্ত, পরোপকার, সীমান্ত,—এই কয়েকটি শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কর।

লর্ড্ উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক্।

(সাধুশীলতা)

প্রাতঃস্মরণীয় গবর্ণর জেনেরল লর্ড্ উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক্ সাত বৎসর ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন।

রাজ্য-বিস্তারে কিংবা রণগৌরবে তাঁহার শাসনকাল বিশেষত্ব লাভ করে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অনুষ্ঠিত বিবিধ শুভকর্ম্ম রাজা ও প্রজার মধ্যে সৌহার্দ্দ্যবন্ধন সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছে বলিয়া তাঁহার পবিত্র স্মৃতি চিরদিন ভারতবাসীর মনে উজ্জ্বল থাকিবে। ভারতবর্ষীয়েরা আধুনিক ব্রিটিশ-শাসনের যে ঔদার্য্যের যশোগান করিয়া থাকেন, মহামতি বেণ্টিঙ্কের শাসনসময়ে সেই উদার নীতির সূত্রপাত হয়। এইজন্যই মনস্বী মেকলে এই মহাত্মার কলিকাতা-মহানগরীস্থ খোদিত প্রতিমূর্ত্তি-মূলে লিখিয়াছেন :—"ইনি নিষ্ঠুর প্রথাসমূহ রহিত করেন, ইনি অসম্মানকর পার্থক্য দূর করেন, ইনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনসাধারণকে স্বাধীন মত-প্রকাশের অধিকার প্রদান করেন, ইনি ইঁহার শাসনাধীন জাতিসমূহের জ্ঞান ও নীতির উন্নতিবিধানের জন্য নিরন্তর যত্ন করেন।"

সতীদাহপ্রথা রহিত করা বেণ্টিঙ্ক্ মহোদয়ের একটি প্রধান কীর্ত্তি। ইহার বিরুদ্ধে পঁচিশ বৎসর তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়প্রমুখ উদার-হৃদয় বহু ব্যক্তি এই প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। ভারতবর্ষীয়গণের কিঞ্চিৎ সহানুভূতি পাইয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্ক্ মহোদয় আইনের দ্বারা এই প্রথা রহিত করেন।

ঠগীনিবারণ সদাশয় বেণ্টিঙ্কের একটি মহতী কীর্ত্তি। মধ্যভারতের অরণ্য-সমাচ্ছন্ন ভূভাগ এই দস্যুদলের প্রধান

লর্ড্ উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক্।

বাসভূমি ছিল। সেই স্থান হইতে তাহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা দলে বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বাংশে লুণ্ঠনযাত্রায় বাহির হইত। অর্থলোভে অসহায় পথিকদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ এবং গলায় ফাঁসী লাগাইয়া তাহাদিগের প্রাণসংহার করা, এই ঠগীদিগের ব্যবসায় ছিল। গুপ্তচরপ্রমুখাৎ তাহারা তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীদের সংবাদ অবগত হইত এবং সুযোগ পাইলেই তাহাদের প্রাণবিনাশ করিত।

ভারতবর্ষীয়দের নিকটে প্রতীচ্যদেশীয় বিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া যে ইংরাজিশিক্ষা অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছে, বেণ্টিঙ্ক্ সেই শিক্ষাপ্রচারের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। তাঁহার শাসনসময়ে এতদ্দেশীয়দিগের উচ্চ রাজকার্য্যলাভের অধিকার বর্দ্ধিত হয়।

প্রজারঞ্জক বেণ্টিঙ্ক্ একদিকে যেমন প্রজাসমূহের যথার্থ হিতসাধনে তৎপর ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ব্রিটিশ-শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য নিরন্তর যত্ন করিতেন। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে অজস্র ব্যয় করিয়া ভারতগবর্ণমেণ্ট যখন ভীষণ আর্থিক সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন, তখনই বেণ্টিঙ্ক্ মহোদয় শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া এদেশে আগমন করেন। সরকারী ব্যয়ের হ্রাস করিয়া, যে সকল জমির উপরে ইতঃপূর্ব্বে ভ্রমবশতঃ করস্থাপন হয় নাই, সেই সকল জমির উপরে কর বসাইয়া এবং মালবপ্রদেশে অহিফেনের উপরে কর ধার্য্য

করিয়া তিনি সরকারী আর্থিক অভাব সম্পূর্ণরূপে বিমোচন করেন।

লোকহিতে তাঁহার আন্তরিক প্রবল অনুরাগ ছিল; এই কারণেও সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তিনি প্রজাবর্গের যেমন সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা ও কোর্ট-অব্-ডিরেক্টর-কর্ত্তৃক সেইরূপ সমাদৃত হইয়াছিলেন।

প্রশ্নাবলী।

১। ঔদার্য্য, শ্রদ্ধা, আনুকূল্য, বিনাশ,—এই শব্দগুলিকে বিশেষণে পরিবর্ত্তিত কর।

২। লর্ড্ বেণ্টিঙ্কের যে দুইটি কার্য্য তুমি তুলনায় বিশেষ কল্যাণকর বলিয়া মনে কর, তাহার উল্লেখ কর।

৩। নিম্নলিখিত পদগুলি কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে বল:— নিরুদ্বেগ, বিরুদ্ধ, সৌহার্দ্দ্য।

প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চিতোরাধিপতি রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র রাণারত্ন অকালে মানবলীলা সংবরণ করিলে তদীয় ভ্রাতা বিক্রমাজিত রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। প্রকৃতিপুঞ্জের

প্রীতিভাজন ও শ্রদ্ধাস্পদ হইতে হইলে যে সকল সদ্‌গুণে বিভূষিত হইতে হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সেই সকল গুণ ছিল না। তদীয় অসৌজন্যে ও অবিমৃশ্যকারিতায় অচিরাৎ রাজ্যমধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে লাগিল। যে সকল সামন্তনৃপতি ও সর্দ্দার বংশানুক্রমে সম্মানপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিলেন, কাপুরুষ বিক্রমাজিত তাঁহাদিগকে নানা-প্রকারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া অপরিণামদর্শী বিক্রমাজিতকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। তাঁহার সহোদর উদয়সিংহ তখন ষড়্‌বর্ষবয়স্ক শিশু। উদয়কে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অভিলাষ না থাকিলেও, বিদ্রোহী সামন্ত ও সর্দ্দারগণ এই সময়ে বনবীর-নামক এক দাসীগর্ভসম্ভূত রাজতনয়কে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন।

বনবীর যেমন বীর্য্যসম্পন্ন তেমনি নানাসদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ও প্রভুত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার গুণরাজি তিরোহিত হইল। আমরণ রাজগৌরব-সম্ভোগের দুর্দ্দমনীয় লালসা তাঁহার মন অধিকার করিল। তিনি জানিতেন যে, সিংহাসনচ্যুত বিক্রমাজিত ও অপ্রাপ্ত-বয়স্ক উদয়সিংহ তাঁহার এই মনোরথসিদ্ধির পথে প্রধান কণ্টক, সুতরাং বিলম্ব না করিয়া উভয়ের প্রাণসংহার করিবার নিমিত্ত বনবীর কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

একদা সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, বিরামদায়িনী রজনী

তিমিরাঞ্চলে ধরণীর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়াছে, পানভোজন সমাপন করিয়া পুরবাসীরা শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময়ে রাজান্তঃপুরে শ্রবণবিদারক হাহাকার ধ্বনি সহসা উত্থিত হইল। সেই তুমুল আর্ত্তরব শ্রবণ করিয়া রাজকুমার উদয়সিংহের বিশ্বস্তধাত্রী পান্নার হৃদয় যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল। এমন সময়ে তাঁহার পরিচিত এক ক্ষৌরকার সেইস্থানে দ্রুতপদে উপস্থিত হইয়া বলিল, "বনবীর রাণা বিক্রমাজিতের প্রাণসংহার করিয়াছেন।" ক্ষৌরকারমুখে সেই আকস্মিক ভীষণ সংবাদ শ্রবণ করায় বুদ্ধিমতী ধাত্রীর হৃদয়ে এক অবশ্যম্ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কা জাগরূক হইয়া উঠিল। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি-প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যেই রাজশোণিত-লুব্ধ দুর্ব্বৃত্ত বনবীরের দুরভিসন্ধি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, চিতোরের চির-পূজ্য রাণাবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া, এই দাসীপুত্র রাজ্য-ভোগবাসনায় উন্মত্ত হইয়াছেন। সুতরাং পাপাত্মা বনবীর বিক্রমকে বধ করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, তিনি অনতিবিলম্বে উদয়ের প্রাণবিনাশেরও উদ্যোগ করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণা ধাত্রী চিতোর-রাজবংশের রক্ষার নিমিত্ত আপনার রমণীহৃদয় সৎসঙ্কল্পের সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া কর্ত্তব্যপালনে স্থিরনিশ্চয় হইলেন। নিদ্রিত রাজকুমারকে একটি পুষ্পকরণ্ডকের মধ্যে স্থাপন করিয়া পান্না পুষ্পসম্ভারে ও বিল্বদলে তাঁহাকে আচ্ছাদন করিলেন এবং সেই

ক্ষৌরকারের হস্তে-করণ্ডক সমর্পণ করিয়া বলিলেন,—"তুমি এই মুহূর্ত্তেই এই করণ্ডক লইয়া দুর্গের বাহিরে গমন কর।"

এইরূপে রাজকুমারকে স্থানান্তরিত করিয়া পান্না তাঁহার প্রাণাধিক শিশুপুত্রটিকে অকম্পিতকরে রাজকুমারের শয্যায় স্থাপন করিয়া গৃহত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে নরপিশাচ বনবীর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া "উদয়সিংহ কোথায়" জিজ্ঞাসা করিলেন। শোণিতলোলুপ বনবীরের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া ধাত্রীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে রাজপুত্রের পালঙ্ক দেখাইয়া দিলেন। পলকমধ্যে নৃশংস বনবীরের তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় ধাত্রীকুমারের বক্ষ বিদ্ধ হইল। পান্না প্রাণাধিক পুত্রের এই শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া একবার প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতেও পারিলেন না। স্নেহের পুত্তলি শিশুপুত্রকে নির্ম্মমকরে সমর্পণ করিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে করিতে তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং স্বীয় পুত্রের জীবনবিনিময়ে যে রাজকুমারের প্রাণরক্ষা হইল, দুর্গের বাহিরে তাঁহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রভুভক্তির এরূপ সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অতীব বিরল।

প্রশ্নাবলী।

১। এই পাঠে প্রভুভক্তি-সম্বন্ধে যাহা জানিলে সংক্ষেপে নিজ

ভাষায় তাহা বল। প্রভুভক্তির আর যদি কোন গল্প জানা থাকে, তাহা বিবৃত কর।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাস-বাক্য লিখ:—রাজ্যভোগ-বাসনা, তিমিরাঞ্চল, আর্ত্তরব, অপরিণামদর্শী।

৩। যাহা সাধন করা যায় না, তাহা সাধন করা; যাহাতে কাঁটা নাই তাহা; কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত:—এই বাক্যাংশগুলির অর্থ একটি সমস্ত শব্দে প্রকাশ কর।

জগদীশ তর্কালঙ্কার।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবদ্বীপে যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পুত্র জগদীশচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। জগদীশ শৈশবেই পিতৃহীন হয়েন। এই দুর্ঘটনায় তাঁহার ভরণ-পোষণের ভার জ্যেষ্ঠ সহোদর ষষ্ঠীদাসের উপরে ন্যস্ত হয়। ষষ্ঠীদাস সর্ব্বদাই পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থসংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন, এই কারণে তিনি ভ্রাতা জগদীশচন্দ্রের সুশিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেন না। তখন চতুষ্পাঠীতে অর্থাৎ টোলে বিদ্যাশিক্ষা করা ব্যয়সাধ্য ছিল না। অধ্যাপকগণ দেশ-বিদেশের ধনী ব্যক্তিদের নিকটে মধ্যে মধ্যে যে সাহায্য পাইতেন, তাহা দ্বারা তাঁহারা স্ব স্ব চতুষ্পাঠীর দরিদ্র বিদ্যার্থীদিগের আহারের সংস্থান করিয়া

দিতেন ; সুতরাং ইচ্ছা করিলে জগদীশ সর্ব্ববিদ্যার কেন্দ্রস্থান নবদ্বীপের কোন টোলে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে শিক্ষা-লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু বাল্যকালে তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছা ছিল না ; তিনি সর্ব্বদাই গ্রামের দুষ্ট বালকদিগের সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়াসক্ত থাকিতেন এবং নানাপ্রকারে গ্রামবাসীদিগের বিরক্তি উৎপাদন করিতেন।

পূর্ব্বোক্তপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির বালক যে, কোন-কালে বিদ্যা ও জ্ঞানে নবদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল করিবে, বাল্যে তাহার সামান্য লক্ষণও প্রকাশ পায় নাই ; কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছায় একটি সামান্য ঘটনা জগদীশচন্দ্রের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। একদিন জগদীশচন্দ্র পক্ষিশাবক সংগ্রহ করিতে তালবৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। বৃক্ষে একটি বিষধর সর্প ছিল ; নীড়স্থিত শাবকভক্ষণার্থে, বোধ হয়, সর্পটি কোনক্রমে বৃক্ষশীর্ষে উঠিয়াছিল। জগদীশচন্দ্রকে দেখিয়া সর্প দংশনোদ্যত হইল। ভীত না হইয়া তিনি সুকৌশলে সর্পের মস্তক মুষ্ট্যাবদ্ধ করিলেন। ইহাতে সর্প দংশন করিল না বটে, কিন্তু দীর্ঘ পুচ্ছ দ্বারা জগদীশ-চন্দ্রের হস্ত শাখার সহিত এপ্রকার দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল যে, তাহাতে তিনি বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। জগদীশ-চন্দ্র ক্ষণকালের জন্যও হতবুদ্ধি হইলেন না। অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে মুষ্টিস্থিত সর্পের মস্তক কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠাইলেন এবং পরে তালশাখার দন্তুর পার্শ্বভাগে ঘর্ষণ করিয়া

মুণ্ড কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। অদূরে এক সন্ন্যাসী দুরন্ত বালকের এই সকল কার্য্য দর্শন করিতেছিলেন। তিনি বালক জগদীশচন্দ্রের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অদ্ভুত চতুরতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

আসন্ন মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জগদীশচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে গৃহাভিমুখে গমন করিতেছেন দেখিয়া, সন্ন্যাসী তাঁহার পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং সর্ব্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা বর্জ্জন করিয়া বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগ দিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। সন্ন্যাসী বুঝিয়াছিলেন, বালক জগদীশচন্দ্রের বুদ্ধি ও চতুরতা সামান্য নয়, পরমেশ্বর যে অপরিমেয় শক্তি তাঁহাকে দান করিয়াছেন, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার হইলে, সংসারের অনেক উপকার হইবে।

জগদীশচন্দ্র সন্ন্যাসীর সদুপদেশ অনুসরণ করিয়া দুরন্ত বালকদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন এবং বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার পূর্ব্বের সমস্ত চপলতা দূরীভূত হইল। দারিদ্র্যনিবন্ধন তিনি তৈল ক্রয় করিয়া প্রদীপ জ্বালাইতে পারিতেন না। এই কারণে রাত্রিকালে পাঠাভ্যাসের সুবিধা হইত না, কিন্তু ইহাও তাঁহার অধ্যয়নের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে নাই। সন্ধ্যার পরে শুষ্ক তৃণপত্র প্রজ্বলিত করিয়া তিনি অগ্নিপার্শ্বে গ্রন্থাদি সহ উপবিষ্ট হইতেন এবং গভীররাত্রিপর্য্যন্ত অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন।

জগদীশচন্দ্র অচিরাৎ তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায়ের প্রচুর

পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপকগণ পাণ্ডিত্যদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তর্কালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় পরিণত বয়সে নবদ্বীপের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।* দূর দেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদোপান্তে উপবেশন করিয়া শিক্ষালাভ করিত। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বহু গ্রন্থ তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার এই গ্রন্থাবলী "জাগদীশী" নামে খ্যাত। অদ্যাপি ন্যায়-চতুষ্পাঠীতে ইহার অধ্যাপনা হইয়া থাকে।

---

* কথিত আছে, যখন জগদীশ নিরক্ষর দুরন্ত বালক ছিলেন, সেই সময়ে লোকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে "জগা" নামে অভিহিত করিত। তৎপরে টোলে প্রবিষ্ট হইয়া যখন তিনি মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত হইলেন, তখন সকলে তাঁহাকে আদর করিয়া "জগু" বলিয়া ডাকিত। জগদীশচন্দ্রের অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় শেষে সেই জগদীশচন্দ্রকে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিতে দেখিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন,—

আদৌ জগা, জগুঃ পশ্চাৎ, জগাজগোরনন্তরম্।
অধুনা জ্ঞানসম্পত্ত্যা জগদীশায়তে জগা॥

অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বে "জগা" ছিলেন, তিনিই পরে "জগু" হইলেন; এখন দেখিতেছি, জ্ঞানসম্পত্তিতে তিনি "জগদীশ" অর্থাৎ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

সার্ সইয়দ্ আহমদ্।

হাজি মোহম্মদ্ মহ্সীন্ ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির পুণ্য নাম কীর্ত্তি হেতু বঙ্গদেশে যেপ্রকার অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে, ভারতবর্ষের আর এক অংশে সার্ সইয়দ্ আহমদের পুণ্যকীর্ত্তি তাঁহার নাম সেইপ্রকার চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। মোহম্মদ্ মহ্সীন্ যে বিপুল বৈভবের অধিকারী ছিলেন, ইচ্ছা করিলে, তাহার সকলই নিজের এবং বংশধরগণের ভোগবিলাসে নিয়োজিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি দারপরিগ্রহ করিলেন না; সংসারে থাকিয়া ভোগে অনাসক্ত যতির ন্যায় তিনি জীবন যাপন করিতে লাগিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার বিশাল ভূসম্পত্তি রোগীর শুশ্রূষায় ও মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার সাহায্যে দান করিয়া এক অপূর্ব্ব মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিলেন। অশেষ-গুণালঙ্কৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার বিচিত্র জীবনের শেষভাগে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে এই অর্থেই তিনি ধনিগণের মধ্যে আসন গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার কোমল হৃদয় পরদুঃখে কাতর হইতে লাগিল; দারিদ্র্যদুঃখে মানব যে, কত যন্ত্রণা ভোগ

করে, তিনি ছাত্রজীবনে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি আর কৃপণের ন্যায় ধন সঞ্চয় করিতে পারিলেন না; তাঁহার উপার্জ্জিত ধনরাশির অধিকাংশই দরিদ্রের দুঃখমোচনে এবং নিঃসহায় বিদ্যার্থীদিগের শিক্ষাদানে ব্যয়িত হইতে লাগিল। সার্ সইয়দ্ আহমদ্‌ও পূর্ব্বোক্ত মনীষি-দ্বয়ের ন্যায় তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মক্ষম জীবন লোকহিতব্রতে নিয়োগ করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া আধুনিক ভারতবর্ষে একটি আদর্শ-চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-নগরে সইয়দ্ আহমদ্ জন্মগ্রহণ করেন। আহমদের মাতা পরম সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। বাল্যকালেই সইয়দ্ আহমদ্ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পারসী ও উর্দ্দূ এই দুই ভাষায় তিনি ঊনবিংশতি বৎসরেই ব্যুৎপন্ন হইয়া-ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি পাঠে আর অধিক-দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; হঠাৎ পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পরিবারবর্গের অন্নসংস্থানের জন্য জ্ঞানচর্চ্চা ত্যাগ করিয়া, তিনি দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

যে সকল মহাত্মা পরার্থপরতার জন্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেকেই জীবনের প্রথমাংশে দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাত সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু দারিদ্র্যদুঃখ তাঁহাদিগকে

সার সইয়দ আহমদ্।

কোন দিন সৎপথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। সইয়দ্ আহমদের জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছিল। পিতৃবিয়োগের পরে যখন পরিবার-প্রতিপালনের দুশ্চিন্তায় তিনি আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন কোন দিনই তিনি সাধুপথ হইতে স্খলিতপদ হয়েন নাই। অগ্নির তাপে সুবর্ণ যেমন বিশুদ্ধ হইয়া উজ্জ্বলতর হয়, যুবক আহমদের চরিত্র দারিদ্র্যের তাপে সেই প্রকারেই উজ্জ্বল ও সুনির্ম্মল হইয়া উঠিল।

সইয়দ্ আহমদের পিতা দিল্লী নগরের এক প্রথিতনামা ব্যক্তি ছিলেন; সুতরাং তাঁহারই চরিত্রবান্ যুবক-পুত্রের সুখ্যাতির কথা প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। আহমদ্ রাজকর্ম্মচারীর পদপ্রার্থী হইয়াছেন জানিয়া, দিল্লীর ইংরাজ-রাজপুরুষগণ তাঁহাকে স্থানীয় সদর-আমীনের আদালতে সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে আহমদ্ ইংরাজি ভাষা জানিতেন না। রাজানুগ্রহে অর্থকৃচ্ছ্র দূর হইল দেখিয়া তিনি অবকাশকালে সোৎসাহে ইংরাজি শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানগর্ভ বহু প্রাচীন আরবী ও পারসী গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। সেরেস্তাদারের পদে তাঁহাকে আর অধিক কাল থাকিতে হইল না; উপরিস্থ রাজপুরুষগণ আহমদের কার্য্যদক্ষতা, অধ্যবসায় ও সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ক্রমে মুন্সেফ্ এবং শেষে সদরালা অর্থাৎ সব্‌জজের পদে উন্নীত করিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন সিপাহীগণ ভারতের কয়েকস্থানে

বিদ্রোহী হইয়া রাজপুরুষ এবং রাজভক্ত ভারতবাসীর উপরে উপদ্রব আরম্ভ করিতেছিল, তখন সইয়দ্ আহমদ্ বিজনৌরে সব্‌জজের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সঙ্কটকালে তিনি স্বীয় জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নিরীহ অধিবাসীদিগের রক্ষার্থে যে অসমসাহসিকতার কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি চিরজাগরূক থাকিবে। কখন স্বহস্তে তরবারিধারণ-পূর্ব্বক ভয়প্রদর্শন করিয়া, কখন বিদ্রোহীদিগের নেতাকে সুকৌশলে বশীভূত করিয়া, তিনি বহু ইংরাজ নরনারী ও রাজভক্ত প্রজাদিগকে সেই উন্মত্ত সিপাহীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সইয়দ্ আহমদ্‌কে রাজভক্ত দেখিয়া সিপাহীগণ তাঁহার দিল্লীর গৃহ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু তিনি এই ক্ষতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বীরের ন্যায় কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। তাৎকালিক রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড্ ক্যানিং এই অপূর্ব্ব রাজভক্তির পরিচয় পাইয়া আহমদ্‌কে বহুমূল্য বস্ত্রাভরণাদি দান করিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যাহাতে সরকার হইতে মাসিক দুইশত মুদ্রা বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাহারও আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

পাঞ্জাব, অযোধ্যা এবং ভারতের উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে মুসলমান অধিবাসীদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সইয়দ্ আহমদের জীবনের আর একটি প্রধান কীর্ত্তি। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষের এই অংশে উচ্চশিক্ষিত মুসলমান দুর্লভ

হইয়া উঠিয়াছিল। দরিদ্র অধিবাসিগণ অল্প শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং ধনী ও সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ সন্তান-দিগের সুশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিতেন না। ইহার ফলে দেশে কলুষচরিত্র ও বিলাসী ব্যক্তির সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সইয়দ্ আহমদ্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সুশিক্ষার বীজ উপ্ত না হইলে, দেশের আর কল্যাণ নাই এবং যে আধুনিক শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন ইংলণ্ড-প্রভৃতি দেশের অধিবাসিবর্গকে জ্ঞানে বিদ্যায় ও কর্ম্মে মানবজাতির বরণীয় করিয়াছে, প্রাচীন আরবী ও পারসী সাহিত্যের অমূল্য রত্নগুলির সহিত তাহা যুক্ত না হইলে, ভারতের আধুনিক মুসলমানসম্প্রদায় কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। স্বধর্ম্মীদিগকে আধুনিক উন্নত প্রথায় সুশিক্ষিত করা, এই সময় হইতে তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইল। উচ্চরাজকর্ম্মচারীর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া তিনি অত্যল্পই অবকাশ পাইতেন; তাহা বৃথা ব্যয় না করিয়া ঐ কালে তিনি স্বয়ং বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে লাগিলেন এবং স্বোপার্জ্জিত ধনের অধিকাংশই বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত রাখিলেন।

পূর্ব্বোক্ত পরম কল্যাণকর কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য সইয়দ্ আহমদ্ পদস্থ ক্ষমতাশালী মুসলমানদিগের নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন; তাঁহার উপার্জ্জিত এবং ভিক্ষালব্ধ অর্থে অচিরাৎ স্থানে স্থানে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

হইতে লাগিল। সদাশয় গবর্ণমেণ্টও সইয়দ্ আহমদের এই উদ্যম প্রত্যক্ষ করিয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক রাজ-প্রতিনিধি লর্ড্ লরেন্স্ বাহাদুর প্রকাশ্য দরবারে সইয়দ্ আহমদের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে একটি সুবর্ণ-পদকও পারিতোষিকরূপে প্রদান করিয়াছিলেন।

সইয়দ্ আহমদের চেষ্টায় স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, ভারতের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের বালকবৃন্দের সুশিক্ষার পথ উন্মুক্ত হইল বটে, কিন্তু তথায় কোন কলেজ না থাকায় মুসলমান যুবকগণ উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকিলেন। দেশের এই অভাব মোচনের জন্য সইয়দ্ আহমদ্ বদ্ধপরিকর হইলেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধীনস্থ উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহ দেখিয়া আসিয়া স্বদেশে তাদৃশ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্পে দ্বিপঞ্চাশদ্বর্ষ বয়সে সইয়দ্ আহমদ ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনবিধি ও শিক্ষাদানপদ্ধতি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যে সাধু সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া বহুব্যয়ে দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন, তিনি তথায় কেবল তাহারই সিদ্ধির উপায়াবিষ্কারে ব্যস্ত থাকিতেন।

স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সইয়দ্ আহমদ্ কলেজ-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে দেশের

অধিবাসিগণ উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এই কার্য্যে সাহায্য করেন, তজ্জন্যও চেষ্টা হইতে লাগিল। দেশের অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই সাধুসঙ্কল্পের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া সদাশয় সইয়দ্ আহমদের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে আহমদ্ ভগ্নোদ্যম বা চিন্তিত হইলেন না। জনসাধারণের নিকটে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি দেশের নগরে ও গ্রামে যে কত বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। অবশেষে সইয়দ্ আহমদের ঐকান্তিক চেষ্টা সার্থক হইয়াছিল; দেশের সম্ভ্রান্ত ধনী মুসলমানসম্প্রদায় তাঁহার সদুদ্দেশ্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া কলেজ-স্থাপনের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হাইদারাবাদের সার্ সালারজঙ্গ্ বাহাদুর এবং রামপুরের নবাব বাহাদুর এই কার্য্যে সইয়দ্ আহমদের পরম সহায় ছিলেন। হিন্দু ধনবান্ ব্যক্তিরাও এই শুভানুষ্ঠানে সাহায্য করিয়াছিলেন।

সইয়দ্ আহমদের আর চিন্তার কারণ রহিল না; কলেজের জন্য আলিগড় নগরে বিশাল অট্টালিকাশ্রেণী নির্ম্মিত হইতে লাগিল এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের এক শুভদিনে তথায় কলেজের প্রতিষ্ঠা হইল। সেই কলেজেই "আঙ্গ্লো ওরিয়াণ্টাল্ কলেজ" নাম গ্রহণ করিয়া সার্ সইয়দ্ আহমদের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ আলিগড়ে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে।

সুলেখক, সুবক্তা এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়াও সার্ সইয়দ্ আহমদ্ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দিল্লীর পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে উর্দ্দু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ইংরাজিতে ভাষান্তরিত হইয়াছিল এবং তাহা পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী তাঁহাকে এসিয়াটিক্ সোসাইটি-নামক পণ্ডিতসভার সভ্যপদে বরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ গ্রন্থকারের লিপিকুশলতা ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ তাঁহার অতি প্রিয় ছিল; ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি কোরাণের একটি বহুমূল্য সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের নরনারীগণ তাঁহার অসামান্য ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সইয়দ্ আহমদ্ রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া এবং স্বদেশে সুশিক্ষার বিস্তার করিয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার জীবনকে সার্থক করিয়াছিল; কিন্তু তথাপি গুণগ্রাহী সদাশয় গবর্ণমেণ্ট্ তাঁহাকে সম্মানিত করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। রাজাজ্ঞায় প্রকাশ্য দরবারে তিনি ক্রমে সি· আই ই এবং কে সি· এস্ আই, উপাধিদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিছু দিনের জন্য তিনি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভার সভ্যরূপেও কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সকল উচ্চ রাজসম্মানলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সার্ সইয়দ্ আহমদ্ আলিগড়ে জীবনের শেষকাল অতিবাহন করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমানমাত্রেরই বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সুদীর্ঘ জীবন কেবল নিঃস্বার্থ পরসেবা ও দেশের কল্যাণে ক্ষেপণ করিয়া, সইয়দ্ আহমদ্ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

প্রশ্নাবলী।

১। সইয়দ্ আহমদ্ কেন সকলের এত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের তিনটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহা বল।

২। সইয়দ্ আহমদের একটি প্রধান কীর্ত্তি উল্লেখ কর।

৩। সৎপথভ্রষ্ট, বিদ্যার্থী, বংশধরগণ, বদ্ধপরিকর,—এই কয়েকটি শব্দের ব্যাসবাক্য লিখ।

৪। ভস্মীভূত, পিপাসু, সংস্থান, অলঙ্কৃত, সৌম্য,—এই শব্দগুলি কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইল বল। "কৃৎ" ও "তদ্ধিত" প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? দুইটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

বাবর।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সকল বীর অনন্যসুলভ শূরত্বের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, বাবর তাঁহাদের অন্যতম। তিনি স্বকীয় ভুজবলে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বীরবর বাবরের জীবনের কেবল-মাত্র শেষ বার বৎসরের সহিত ভারত-ইতিবৃত্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। দিল্লীর সিংহাসন অধি-কার করিয়া তিনি পাঁচ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন এবং উক্ত সময় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবর্গের সহিত সংগ্রামেই অতিবাহিত হইয়াছিল; সুতরাং রাষ্ট্র-সংগঠনে তিনি তাঁহার যোগ্যতার পরিচয়প্রদানের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। একখানি ইষ্টকমাত্র ভূমিতে প্রোথিত করিয়া তিনি ভিত্তি-স্থাপনপূর্ব্বক ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন,

বাবর।

তদীয় সুযোগ্য পৌত্র ভুবনবিশ্রুত আকবর তাহারই উপরে মোগলসাম্রাজ্যরূপ লোকমনোমোহন সুবিশাল সৌধ নির্ম্মাণ করেন। ভারতের ইতিবৃত্ত তাঁহাকে চির-কাল বিজয়ীর গৌরব দান করিবে। তিনি নানা আয়ুধে সুসজ্জিত বীরের বেশে ভারতবর্ষের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বাবরের চরিত্রে অপূর্ব্ব উদ্যমশীলতা সাহসিকতা ও কর্ম্মপটুতা পরিলক্ষিত হইত। বাল্যে ও যৌবনে নানা কর্ম্মোদ্যমে, অসংখ্য যুদ্ধে ও অভিযানে বারংবার বিফল-মনোরথ হইয়াও, তিনি যে অবিচলিত অধ্যবসায় অসীম সহিষ্ণুতা এবং গভীর একাগ্রতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; তাঁহার সেই গুণগ্রাম মানবমাত্রেরই বরণীয়। ঐতিহাসিক মির্জ্জা হায়দর বলেন, "বাবর অশেষগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন; মানবপ্রীতি ও নির্ভীকতা এই গুণদ্বয় তাঁহার অপর সদ্গুণরাশি অতিক্রম করিয়া উচ্চে বিরাজ করিত। তুর্কিকবিতা-রচনায় তাঁহার স্থান একমাত্র আমির আলি সিরের নীচে ছিল।" পারসিক ভাষায়ও তিনি সুকবি ও সুলেখক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায় তিনি লিপি-চাতুর্য্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বর্ণনার লালিত্যে এবং ভাবের প্রাচুর্য্যে তাঁহার রচনাবলী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আত্মজীবনীতে তিনি তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের সুখদুঃখ, পাপপুণ্য,

জয়-পরাজয় ও সফলতা-বিফলতা অনন্যসুলভ সরলতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

বাবরের আত্মজীবনী-পাঠে অবগত হওয়া যায়, তিনি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতার মৃত্যুতে ফারগনা (বর্ত্তমান কোকন) রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। এই পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র রাজ্যের তিন দিক্ চিরতুহিনাবৃত শৈলপ্রাকারে বেষ্টিত, কেবলমাত্র পশ্চিম পার্শ্ব ধৌত করিয়া কলনাদিনী স্বচ্ছতোয়া এক পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত। বিচিত্র বর্ণের অসংখ্য কুসুম, প্রচুর শস্য এবং বিবিধ সুরসাল ফল প্রকৃতির এই নিভৃত নিকেতনকে সুরম্য করিয়া তুলিয়াছিল। মাতৃভূমির অতুলনীয় নৈসর্গিক শোভা ভাবুক বীর বাবরের মনের উপর অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দিল্লীর অমিত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া তিনি নিরাশহৃদয়ে এক সময়ে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"চিত্তে আনন্দ দান করিবার মত এদেশে কিছুই দেখিতেছি না। এ রাজ্য একান্ত কুৎসিত, এখানকার প্রাসাদাবলী ও প্রান্তর বৈচিত্র্যবিহীন।"

পিতৃসিংহাসন-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিভাশালী বালকের বিপৎসঙ্কুল জীবনের সূত্রপাত হইল। তাঁহার জনক ওমর সেখ মিরজা তৈমুরলঙ্গের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। তৈমুরের অপর বহু বংশধর ফারগনার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী সগোত্রগণ বাবরকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য সমরানল প্রজ্বলিত

করিলেন। প্রবল প্রতিযোগিগণের আক্রমণে বাবরের রাজ্যের পরিসর ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয়ের উচ্চাভিলাষ দূরীভূত হইল না; তিনি পৈতৃক রাজ্য ও তৈমুরের রাজধানী সমরখণ্ডের পুনরুদ্ধারসাধনের জন্য নিয়ত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সমরখণ্ড একবার তাঁহার করতলগত হইল; কিন্তু অমিতশূরত্বসম্পন্ন হইয়াও সৈন্যবলের অভাবে বাবর তাঁহার অধিকার দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রতিপক্ষীয়গণ তাঁহার পিতৃরাজ্য ফারগনা ও নবলব্ধ সমরখণ্ড উভয় প্রদেশ বলপূর্ব্বক জয় করিয়া লইলেন। আত্মজীবনীতে তিনি তাঁহার এই সময়ের দুর্গতি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন— "আমি ভীষণ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছিলাম, মনের দুঃখে ক্রমাগত ক্রন্দন করিতাম।" কিন্তু এইরূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয়েও পুরুষসিংহ বাবরের হৃদয়ের অদম্য উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি পুনর্ব্বার সুকৌশলে সমরখণ্ড জয় করিলেন, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি কুপিতা ছিলেন, উজবেগের অধিপতি সাইবিনি তাঁহাকে অচিরে সমরখণ্ড হইতে বিতাড়িত করিলেন।

আশ্রয়শূন্য বন্ধুহীন বাবর এই সময়ে অনন্যোপায় হইয়া, এক বৃদ্ধা মেষপালিকার পার্ব্বত্য ভবনে গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন। বৃদ্ধা এই তরুণহৃদয় বীরের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত তাঁহার নিকটে তৈমুরের ভারত-আক্রমণ বর্ণনা করিতেন। বৃদ্ধার আখ্যান শ্রবণ করিয়া বাবরের কল্পনাদৃষ্টির

সম্মুখে ঐশ্বর্য্যময়ী ভারতভূমির মনোমোহিনী মূর্ত্তি উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিত। ভারত-বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতেছিল।

সুদীর্ঘকাল প্রতিকূল দৈবের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়াও বাবরের অদম্য উৎসাহ কিঞ্চিন্মাত্র প্রশমিত হইল না। ভাবী গৌরবলাভের সুনিশ্চিত আশায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া, তিনি নানাস্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক বাল্কের নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিপতি বাখরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। বাখর প্রসন্নমনে বীরশ্রেষ্ঠ বাবরের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিলেন। বাবর তাঁহার এই দুর্দ্দিনের বন্ধু বাখরকে বলিয়াছিলেন— "ভাগ্যলক্ষ্মী আমাকে তাঁহার ক্রীড়াকন্দুকরূপে ব্যবহার করিতেছেন, একবার আমি তাঁহার অঙ্কে স্থান লাভ করিতেছি, আবার দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছি। এতকাল আমি আপন অভিলাষানুসারে কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু কোন স্থায়ী সুফল লাভ করিতে পারি নাই। এক্ষণে আপনার তুল্য সহৃদয় সুহৃদের উপদেশ লাভ করিলে পরম আনন্দিত হইব।" এই সময়ে কাবুলে অরাজকতা চলিতেছিল, বন্ধুবর তাঁহাকে উক্ত রাজ্য জয় করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। বাবরের পিতৃব্য-পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক আব্দুর রজ্জক তখন কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কাবুলীরা এই বালকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং কোন কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি রাজপদলাভের দুরাশায় শিশুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

বাবরেরও উচ্চাভিলাষের অন্ত ছিল না। কোন না কোন রাজ্য লাভ না করিতে পারিলে, তিনি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। সেই জন্যই হিতৈষী বন্ধুর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অনতিবিলম্বে তিনি কাবুল-বিজয়ের জন্য যাত্রা করিলেন। অল্পায়াসেই কাবুল তাঁহার করতলগত হইল। বাবর আবার রাজপদ লাভ করিলেন। তাঁহার জীবনের উত্থান ও পতন অতীব বিস্ময়কর। ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনে তিনি কখন বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছেন, আবার কখন সহায়সম্পদ্-বিহীন হইয়া বৃক্ষতলে পথিপার্শ্বে কিংবা পর্ব্বতগুহায় ভিখারীর জীবন যাপন করিয়াছেন। এবংবিধ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন তাঁহার জীবনকাহিনী উপন্যাসের ন্যায় চিত্তস্পর্শী করিয়াছে।

আত্মজীবনীতে বাবর কাবুলের বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই রাজ্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়াছিল। দুরারোহ পার্ব্বত্য প্রদেশের দুষ্প্রাপ্য কুসুমরাজির শোভা ও সৌরভ তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি এই রাজ্যের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকের চরিত্র, পুরাবৃত্ত, প্রচলিত বিবিধ ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

তিনি জ্ঞাতি-ভ্রাতা হিরাতের রাজকুমারগণের সহিত সাক্ষাৎকার-মানসে কাবুল হইতে উক্ত নগরে গমন করিয়াছিলেন। এই নগরে পানদোষ তাঁহাকে আক্রমণ করে

এবং ঐ অনর্থকর অভ্যাসই, অকালে তাঁহার জীবনশিখা নির্ব্বাপিত করে। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভগবৎকৃপা-লাভের নিমিত্ত পানদোষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরিত্রবল প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাবর আত্মজীবনীতে সরল-ভাবে তাঁহার এই দোষ বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সমাজে মদ্যপান জনসাধারণ-মধ্যে প্রচলিত ছিল। হিরাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে ঝটিকাক্রান্ত হইয়া তিনি অবর্ণনীয় ক্লেশ পাইয়াছিলেন। সেই দুর্য্যোগের মধ্যেও তিনি তাঁহার মানবপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সপ্ত দিন সপ্ত রাত্রি অবিশ্রাম পথ চলিয়া বাবর ও তাঁহার সহযাত্রিগণ একটি সঙ্কীর্ণ গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। অনুচরগণ বাবরকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাত্রি যাপন করিতে অনুরোধ করিল, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা ক্লেশ ভোগ করিবে, আর আমি আরামে রাত্রি যাপন করিব, তাহা কখনও হইতে পারে না। আমিও তোমাদের সহিত দুঃখের অংশ গ্রহণ করিব। পারসিক ভাষায় একটি প্রবাদ আছে যে, 'বন্ধুর সহিত মৃত্যুপথে গমন ও ভোজের আনন্দ অভিন্ন।'" বাবর অনাবৃত স্থানে সকলের সঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের মস্তকে কর্ণে ওষ্ঠে অধরে চারি ইঞ্চি স্থূল তুষার পতিত হইয়াছিল। বাবরের বন্ধুপ্রীতি এত গভীর ছিল

বলিয়াই, ভীষণ দুর্গতির দিনেও অনুচরগণ তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই।

কাবুলের সিংহাসন লাভ করিবার পরে বাবর আর একবার সমরখণ্ড জয় করেন, কিন্তু আবার অল্পদিনের মধ্যেই উক্ত রাজ্য তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। পুনঃপুনঃ ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি সমরখণ্ড ও ফারগনার আশা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উচ্চাভিলাষী মন কাবুলের প্রভুত্ব পাইয়া কোন-ক্রমেই পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। এই সময়ে ভারত-বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিত্ত মাতাইয়া তুলিল। তিনি সৈন্যবল সহ একে একে পাঁচবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং পঞ্চমবারে স্থলতান ইব্রাহিমলোদিকে পানিপথ ক্ষেত্রে পরাভূত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন।

পানিপথে ও ফতেপুর শিক্রিতে বাবর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যে গৌরব লাভ করিয়াছেন, ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। অবস্থার প্রতিকূলতা, প্রবলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শোকদুঃখের আকস্মিক আক্রমণ কখনও তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেন—"যদি ভগবান্ আমাকে স্বয়ং বিনাশ না করেন, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে, আমার একটি শিরাও ছিন্ন করিতে পারিবে না।"

বাবরের পারিবারিক জীবন সুখময় ছিল। তিনি

পুত্রকন্যাদিগকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। আত্মজীবনীতে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—"এমন সময়ে হুমায়ুন আসিয়া উপস্থিত হইল, আমার চিত্ত গোলাপের ন্যায় প্রফুল্ল এবং নয়ন আলোকশিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল।" কাবুল হইতে তাঁহার দুহিতা গুলবদন যখন দিল্লীতে আসিতেছিলেন, তখন একদিন অপরাহ্ণে বাবর্ সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার কন্যা রাজধানীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছেন। এই সংবাদ-শ্রবণমাত্র বাবর সামান্য বস্ত্রে দ্রুতপদে দৌড়িয়া ছয় মাইল গমনপূর্ব্বক কন্যার দর্শন লাভ করেন।

বাবর যেমন স্নেহশীল জনক ছিলেন, তেমনি তেজস্বী বীর ও অসাধারণ চরিত্রবলসম্পন্ন ভূপতি ছিলেন। এইজন্য তিনি অদ্যাপি ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন।

প্রশ্নাবলী।

১। ক্রীড়াকন্দুক, উদ্ভাসিত, পুরুষসিংহ, ভাগ্যবিপর্য্যয়, শূরত্ব, আয়ুধ,—এই কয়েকটি শব্দের অর্থ বল।

২। জীবনশিখা, মনোরঞ্জন, চিরতুহিনাবৃত, কলনাদিনী,—এই গুলির ব্যাসবাক্য বল।

৩। অমিত, নৈসর্গিক, বিস্তৃত, দুর্দ্দিন, আরোহণ, বিজয়, প্রতিকূল, অধস্তন,—এইগুলির বিপরীতার্থ-বোধক শব্দ বল। "দুর্দ্দিন" শব্দটির যদি একাধিক অর্থ থাকে, তাহা বল।

৪। বাবরের জীবনের কোন ঘটনা হইতে তাঁহার স্নেহশীলতার

পরিচয় দাও। "বন্ধুর সহিত মৃত্যুপথে গমন এবং ভোজের আনন্দ অভিন্ন"—এই পারসিক প্রবাদ-বাক্যের অর্থ কি?

৫। নির্ব্বাপিত, অধ্যবসায়, প্রতিভাত,—এই কয়েকটি কি প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে?

অধ্যবসায়ী আনন্দমোহন।

বর্ষার জলধারায় ও শীতের শিশিরে স্নাত হইয়া তরুলতাগুল্ম যে শক্তি সঞ্চয় করে, তাহা বসন্তের দক্ষিণবায়ুর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া তাহাদিগেরই মধ্যে সুপ্ত থাকে; বসন্তে মলয়ানিলের কোমলস্পর্শ প্রাপ্ত হইলে ঐ শক্তি জাগরিত হইয়া সহস্র সহস্র পত্রপল্লবকুসুমে মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশ পায়। মানব যখন পরমেশ্বরদত্ত দুর্লভ শক্তি এবং প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তখন তাহাও ঐপ্রকার একটা উপলক্ষ্যের প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

আমরা বঙ্গের যে মনীষীর পরিচয় প্রদান করিতেছি, তাঁহারও প্রতিভা একটি সামান্য ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া জাগরিত হইয়াছিল। মহাত্মা আনন্দমোহন বসু বাল্যে অত্যন্ত চঞ্চল ও পাঠে অনাবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার

অধ্যবসায়ী আনন্দমোহন।
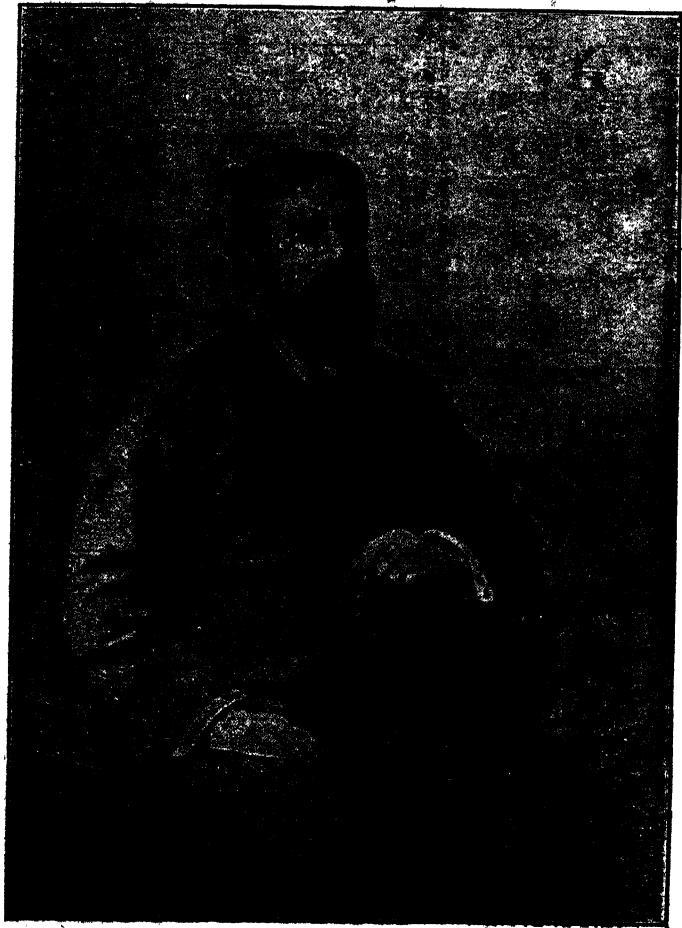
এক আত্মীয় এই নিমিত্ত তাঁহাকে তিরস্কার করেন। বালক তিরস্কৃত হইয়া আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন, "আমি আজ হইতেই চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া পাঠে মনোযোগী হইব।" এই তুচ্ছ ঘটনা চঞ্চল ও অনাবিষ্ট আনন্দমোহনের সমস্ত সুপ্ত শক্তি ও প্রতিভা উদ্বোধিত করিয়া তাঁহাকে এমন সুশীল বালকে পরিণত করিয়াছিল যে, তাঁহার সেই আত্মীয় অবাক্ হইয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রামে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আনন্দমোহনের জন্ম হয়। তিনি নয় বৎসর বয়সে ময়মনসিংহের হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। প্রথম শ্রেণীতে এক বৎসর পাঠ না করিলে বৃত্তিপরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না; কিন্তু বালক আনন্দমোহন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। এই ঘটনা সর্ব্ব-প্রথমে শিক্ষক ও সহপাঠীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, চারিদিকের সাধুবাদ বালককে অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই; বরং যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সংযম ও নিরহঙ্কারতা আনন্দমোহনকে পরবর্ত্তী জীবনে বিখ্যাত করিয়াছিল, এই সময় হইতে তাহারই উন্মেষ দেখা গিয়াছিল। ইহার পরে প্রত্যেক পরীক্ষায় ইনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ-জেলাস্কুলে অধ্যয়নকালে এমন দিন গিয়াছে,

যখন পঞ্চদশবর্ষীয় আনন্দমোহন একবারও শয্যাতল আশ্রয় না করিয়া সুদীর্ঘ রজনী কেবল পাঠেই অতিবাহিত করিয়াছেন। পার্শ্বে শয্যা প্রস্তুত, এক বন্ধু তথায় শয়ন করিয়া হঠাৎ নিদ্রাগত হইয়াছেন, আনন্দমোহন বন্ধুর বিরক্তি-উৎপাদনের আশঙ্কা করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করেন নাই; সমস্ত রাত্রি কেবল পাঠে মনঃসংযোগ করিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন। ইহা আনন্দমোহনের পাঠানুরাগের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে আনন্দমোহনের পিতা পদ্মলোচন বসু মহাশয়ের মৃত্যু হয়। এই পারিবারিক দুর্ঘটনা আনন্দমোহনের হৃদয়ে এরূপ আঘাত প্রদান করিয়াছিল যে, তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই; নবম স্থান অধিকার করিয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আনন্দমোহন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় এমন কৃতিত্ব দেখাইতেন যে, পরীক্ষক উত্তরপত্র পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেন। সেই সময়ে বঙ্গে আনন্দ-মোহনের সমকক্ষ কোন ছাত্রই ছিল না।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে একদিন তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি সার্ জন্ লরেন্স্ কলেজের পাঠাগার প্রভৃতি

পরিদর্শন করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমনের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন কলেজের অধ্যক্ষ সট্‌ক্লিফ্ সাহেব আনন্দমোহনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি যদি কলেজের এই সামগ্রীটি দর্শন না করিয়া গমন করেন, তবে আপনার এই পরিদর্শন ব্যর্থ হইবে।" লর্ড্ লরেন্স্ অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট আনন্দমোহনের অসাধারণ বুদ্ধির কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে আর একটি সামান্য ঘটনা আনন্দমোহনের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। গণিতের অধ্যাপক একদিন তিনটি কঠিন প্রশ্ন লিখিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন, "এই প্রশ্নত্রয়ের মধ্যে যে বালক প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিবে, তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ছাত্র বলিয়া জানিব; এবং যে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিবে, সে নিশ্চয়ই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবে।" আনন্দমোহন নীরবে অধ্যাপকের উক্তি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিবে, তাহার সম্বন্ধে কি বলেন?" অধ্যাপক উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "অসম্ভব"! আনন্দমোহন বলিলেন, "যদি অসম্ভবই সম্ভব হয়?" ইহাতে অধ্যাপক উত্তর করিলেন, "যদি এই অসম্ভবই সম্ভব হয়, তবে উত্তরদাতা কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিত্যালয়ের গণিতের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমার আসনে উপবেশন করিবেন।" আনন্দমোহন তিনটি

প্রশ্নেরই যথার্থ উত্তর দিয়া অধ্যাপককে বিস্মিত করিয়াছিলেন এবং পরে অধ্যাপকের উক্তির কিয়দংশ সার্থক হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে কতিপয় বৎসরের মধ্যে বি এ, ও এম এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষায় দশসহস্র মুদ্রা বৃত্তিলাভ করিয়া আনন্দমোহন পাঠ শেষ করিবার জন্য বিংশতি বৎসর বয়সে ইংলণ্ডযাত্রা করিয়াছিলেন। প্রতিভা কখনই লুক্কায়িত থাকে না। চারি বৎসরের মধ্যে গ্রীক্, লাটিন্ প্রভৃতি নূতন ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি কেম্ব্রিজের সর্ব্বোচ্চ গণিতপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "র‍্যাংলার" উপাধি লাভ করেন। ভারতীয় ছাত্রদিগের মধ্যে আনন্দমোহনই সর্ব্বপ্রথমে এই স্পৃহণীয় উপাধি লাভ করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। ইহার পরে ব্যবহারশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের কার্য্যে যোগদান করেন।

বিনয়, সংযম ও ভক্তিপ্রবণতা তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রধান ভূষণ ছিল। অতি দরিদ্র ব্যক্তিও তাঁহার নিকট সমাদৃত হইতেন।

ব্যবসায়ব্যপদেশে এবং উপদেশাদি-গ্রহণে শত শত লোক প্রতিদিনই আনন্দমোহনের নিকট উপস্থিত হইতেন। কেহ কখনও তাঁহাকে রূঢ় কথা বলিতে শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু কেহ অন্যায় আচরণ করিলে সেই ধীর ও বিনয়ী আনন্দমোহন

দৃপ্ত সিংহের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া পড়িতেন। তিনি কখনই মুহূর্ত্তকাল বৃথা গল্প বা লঘু আমোদে ক্ষেপণ করেন নাই। আনন্দমোহন চিকিৎসকের আদেশে সম্পূর্ণ বিশ্রামে জীবনের শেষ কয়েক মাস যাপন করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মবর্জ্জিত অবস্থা পীড়া অপেক্ষাও তাঁহাকে অধিকতর যাতনা প্রদান করিয়াছিল।

আনন্দমোহন যে ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে উন্নতিলাভের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনাররূপে প্রাণপণে রাজকার্য্যে সাহায্য করিতেন। কিন্তু কোন বিশেষ কর্ম্মপ্রবাহে পতিত হইয়া, তিনি কখনই আত্মহারা হয়েন নাই। অর্থোপার্জ্জন জীবনের লক্ষ্য হইলে, তিনি স্বীয় অনন্যসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অদ্ভুত বাগ্মিতার সাহায্যে মৃত্যুকালে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা রাখিয়া যাইতে পারিতেন। যশোলিপ্সা বা অর্থের কুহক কখনই আনন্দমোহনকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দিবসের শ্রমের পরে তিনি রাত্রিজাগরণ করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ ও ঈশ্বরচিন্তা করিতেন। রাত্রি দুই ঘটিকার পূর্ব্বে প্রায়ই তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেন না। প্রাতঃকালে আবার নূতন বল সঞ্চয় করিয়া দিবসের কার্য্যে যোগদান করিতেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এক দিবস আনন্দমোহন অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এক মূর্চ্ছাই ক্রমে সাংঘাতিক রোগে

পরিণত হইয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২০এ আগষ্ট তারিখে আনন্দমোহনকে হরণ করিয়া লইয়াছিল।

মনুষ্য কখনই চিরজীবী হয় না। কিন্তু আনন্দমোহন তাঁহার জীবনে অধ্যবসায়, জ্ঞান ও কর্ম্মের যে অপূর্ব্ব মিলন দেখাইয়াছেন এবং বিনয় ও ধৈর্য্যের যে উজ্জ্বল চিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার স্মৃতি বহুকাল জাগরূক রাখিবে।

প্রশ্নাবলী।

১। আনন্দমোহনের বাল্যজীবনের পরিচয় দাও,—কোন্ কোন্ গুণ তাঁহার চরিত্রে বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছিল ?

২। "কর্ম্ম-বর্জ্জিত" এবং "বর্জ্জিত-কর্ম্ম" এই দুইটি শব্দের মধ্যে যদি কোন অর্থগত পার্থক্য থাকে বল এবং শব্দদ্বয়ের ব্যাসবাক্য লিখ।

৩। "তিনটি প্রশ্ন" "অহঙ্কার নাই যাহার" "কর্ম্মের প্রবাহ" "পত্র পল্লব ও কুসুম,"—এই তিনটির সমানার্থ-বোধক একএকটি সমস্ত শব্দ গঠন কর।

৪। "নিষ্ঠা" এবং "সংযম" এই দুইটি শব্দের ব্যুৎপত্তি বল এবং ঐ দুইটি শব্দকে বিশেষণে পরিবর্ত্তিত করিলে কি প্রকার রূপ হইবে বল।

উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীর আত্মরক্ষা।

মনুষ্যজাতির সুব্যবস্থিত সমাজ আছে, তাহার উপরে রাজা ও শাসনকর্ত্তা আছেন, সুতরাং কেহ কাহারও উপরে অত্যাচার করিলে সমাজের নিকটে প্রতিকার দাবী করা চলে এবং রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া বিচার প্রার্থনা করা যায়। রাজা ও সমাজ অত্যাচারীকে দণ্ডিত করেন; অত্যাচারের শান্তি হইয়া যায়। যখন ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি প্রাণী উপদ্রব আরম্ভ করে, বুদ্ধিমান্ মানুষ নানা কৌশলে তাহাদিগকে নিহত বা তাড়িত করে; সুতরাং উপদ্রবের শান্তি হয়। উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীদিগের রাজা নাই এবং মানবসমাজের ন্যায় তাহাদের সুব্যবস্থিত সমাজও নাই; সুতরাং দণ্ডনীতি নাই এবং অত্যাচারীর উপর দণ্ডবিধানের ব্যবস্থাও নাই। পরমেশ্বর এই নিঃসহায় জীবগুলিকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহাদিগের দেহে যে সকল সুব্যবস্থা রাখিয়াছেন, আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

যোদ্ধা যখন শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হয়, তখন তাহাকে নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতে হয় এবং যাহাতে শত্রুর প্রহরণ হঠাৎ কোন অঙ্গে আঘাত না দেয়, তজ্জন্য দেহকেও কঠিন বর্ম্মে আচ্ছাদিত রাখিতে হয়। নিঃসহায় উদ্ভিদ্গণ শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য অবিকল পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সজ্জিত থাকে।

উদ্ভিদের এই যোদ্ধৃবেশের কথা উত্থাপন করিলে প্রথমেই কাঁটা সেজনামক বৃক্ষের কথা আমাদিগের স্মরণপথে উদিত হয়। এই শ্রেণীর উদ্ভিদের সর্ব্বাঙ্গে সে ঘনসন্নিবিষ্ট কণ্টক থাকে, তাহা গবাদির আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে অনায়াসেই রক্ষা করে। বৈশাখের প্রখর তাপে যখন প্রান্তর তৃণবর্জ্জিত হয়, তখন গো-ছাগাদি পশুগণ গ্রাম্য পথের পার্শ্বে বা কৃষি-ক্ষেত্রের সীমান্তবর্ত্তী স্থানে এই বৃক্ষগুলিকে সরস অবস্থায় দেখিয়া ধাবমান হয়; কিন্তু স্পর্শ করিবামাত্র তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকে এমন আঘাত প্রাপ্ত হয় যে, আর জীবনেও পশুগণ সেই সকল বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইতে সাহসী হয় না।

পাল্‌তামাদার কাঁটানটে খর্জ্জুর প্রভৃতি উদ্ভিদের পত্র গবাদি পশুর উপাদেয় খাদ্য। এই কারণে উদ্ভিজ্জ-ভোজী পশুদিগের সহিত ইহাদিগকে নিয়তই সংগ্রাম করিতে হয়। পরমেশ্বর ইহাদিগকে এমন অস্ত্রে সুসজ্জিত রাখিয়াছেন যে, কোন পশুই সেই অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া অপকার করিতে সাহসী হয় না। খর্জ্জুরের পত্রশীর্ষের তীক্ষ্ণ কণ্টক পশুর উপদ্রব-নিবারণের মহাস্ত্র। বদরী অর্থাৎ কুলবৃক্ষের সুসজ্জিত পত্রের মূলে এক একটি কণ্টক নিম্নমুখ হইয়া অবস্থান করে। ইহাতে কেবল গবাদি পশুরই উপদ্রবশান্তি হয় না; শুঁয়োপোকা প্রভৃতি যে সকল পত্রভোজী ক্ষুদ্র প্রাণী উদ্ভিদের অনিষ্ট সাধন করে, এই ব্যবস্থায় তাহাদিগকেও বাধা দেওয়া হয়। ইহারা একবার

কণ্টকাঘাতে ক্ষতাঙ্গ হইলে জন্মের মত এই সকল বৃক্ষের কোমল ও সুস্বাদ পত্রভক্ষণের আশা ত্যাগ করে। গোলাপের কেবল পত্রমূলেই কণ্টক থাকে না; ইহার প্রায় সর্ব্বাঙ্গই ক্ষুদ্র বৃহৎ নিম্নমুখ কণ্টকে পূর্ণ। গো-মহিষাদি সহসা ইহা-দিগকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং ক্ষুদ্র কীট যে কাণ্ড-শাখাদি-অবলম্বনে হঠাৎ উঠিয়া উহাদের কোমল মুকুল ও নবপত্রগুলিকে উদরসাৎ করিবে, তাহারও উপায় থাকে না। বেগুনের শাখা-প্রশাখা এবং পত্রপুষ্প সকলই সাধারণতঃ কণ্টকিত হইয়া জন্মে। এই সকল ব্যবস্থাসত্ত্বেও গোলাপে এবং বেগুনে অনেক সময়ে কীট দৃষ্ট হয়. সত্য, কিন্তু এই বৃক্ষগুলি কণ্টকযুক্ত হইয়া জন্মে বলিয়াই কীটের উপদ্রব তাদৃশ লক্ষিত হয় না।

গোলাপের কাঁটা।

বিল্বাদি বৃক্ষের কণ্টক-বিন্যাসে আর একপ্রকার সুব্যবস্থা দেখা যায়। ইহাদের ভূমির নিকটবর্ত্তী শাখার প্রত্যেক পত্রের বৃন্তমূলে দুইটি করিয়া দীর্ঘ কণ্টক সজ্জিত

থাকে। উদ্ভিদ্‌ভোজী পশুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্যই যে বৃক্ষে এই ব্যবস্থা আছে, শাখা-প্রশাখাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল বৃক্ষের ঊর্দ্ধস্থ শাখাপ্রশাখায় তাদৃশ কণ্টক থাকে না। ভূতলের নিকটবর্ত্তী যে শাখা-প্রশাখাগুলিকে গোমহিষ-ছাগাদি নষ্ট করিতে পারে, কেবল সেইগুলিই কণ্টকবহুল হইয়া জন্মে। মানব নিজের হাতে যে সকল দ্রব্য নির্ম্মাণ করে তাহাতে যথেষ্ট বাহুল্য ও অনাবশ্যক চাকচিক্য থাকে, কিন্তু পরমেশ্বরসৃষ্ট কোনও বস্তুতে এইগুলি দেখা যায় না।

যে সকল বৃক্ষের পত্র সুস্বাদ, ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ তাহাদের পরম শত্রু। এই সকল শত্রুর আক্রমণনিবারণের জন্য অনেক উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখা সূক্ষ্ম লোমের ন্যায় শুঁয়ো দ্বারা আবৃত দেখা যায়। এগুলি এমন সুকৌশলে সজ্জিত থাকে যে, ক্ষুদ্র কীট কোনক্রমে তাহাদের বাধা অতিক্রম করিয়া পত্রপুষ্পে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না।

বিছুটি।

বিছুটি, আলকুসি প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌ও শুঁয়োগুলির সাহায্যে শত্রু দমন করে। পরীক্ষা করিলে ইহাদের শুঁয়োর অভ্যন্তরে একপ্রকার বিষাক্ত রস দেখা যায়।

পত্রাদি স্পর্শ করিবামাত্র সূক্ষ্মাগ্র শুঁয়ো দেহপ্রবিষ্ট হইয়া ভগ্ন হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষাক্ত রস রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া এমন জ্বালাযন্ত্রণার সূত্রপাত করে যে, ভবিষ্যতে কোন প্রাণী এই শ্রেণীর উদ্ভিদ্‌গুলির সমীপ-বর্ত্তী হইতে সাহস করে না।
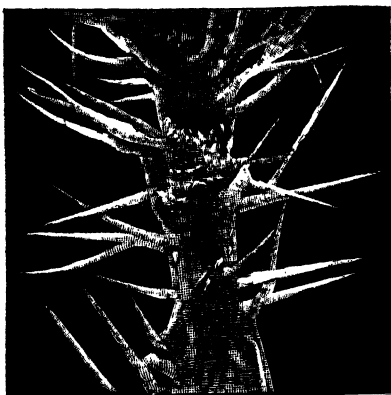
অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বিছুটির শুঁয়ো।

কেবল গবাদি পশু এবং ভূচর কীটগণই উদ্ভিদের শত্রু নহে; মৃত্তিকার নিম্নেও বহু শত্রু বর্ত্তমান। ইহারা মূল ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষগুলিকে নষ্ট করে। কণ্টকের সাহায্যে এই শত্রুদিগকে দমন করা যায় না, এই নিমিত্ত আত্মরক্ষার জন্য ইহাদের দেহে অপর ব্যবস্থা থাকে। অনেক বৃক্ষের মূল এত বিস্বাদ ও বিষাক্ত হইয়া জন্মে যে, কোনও কীটই তাহাদের মূল স্পর্শ করিতে পারে না। ওল কচু প্রভৃতির মূল সত্যই বিষাক্ত এবং বিষাক্ত মূলই ইহাদের আত্মরক্ষার প্রধান সহায়।

প্রাণিজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নানা নিঃসহায় ইতর প্রাণীকেও আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত

দেখা যায়। বিড়াল, কুকুর, ব্যাঘ্র, শ্যেন, শকুনি, কাক প্রভৃতি মাংসাদ পশুপক্ষীর তীক্ষ্ণ নখর তাহাদের আহার্য্য-সংস্থান ও আত্মরক্ষা উভয়েরই পরম সহায়। গবাদি পশুর শৃঙ্গই তাহাদিগের আত্মরক্ষার অস্ত্র। শম্বুকজাতীয় প্রাণিগণ যে কত নিঃসহায় তাহাদের গতিবিধি পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায়। কোন শত্রুর আক্রমণ-সম্ভাবনা থাকিলে যে শীঘ্র পলায়ন করিয়া নিরাপদ্ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এপ্রকার গতিশক্তি তাহাদের নাই। সুতরাং এক একটি সুগঠিত দুর্গ পৃষ্ঠে রাখিয়া ইহারা পরিভ্রমণ করে এবং শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা উপস্থিত হইলেই, সেই দুর্গাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মরক্ষা করে। শঙ্খ প্রভৃতি সমুদ্রচর প্রাণিদেহের স্থূল ও কঠিন আবরণগুলিকে আত্মরক্ষার জন্যই ঈশ্বর দেহে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। কয়েকজাতীয় সামুদ্রিক শম্বুকের দেহে সূক্ষ্মাগ্র কণ্টকও সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। বর্ম্ম ও খড়্গে সজ্জিত থাকিয়া ইহারা নিরাপদে সমুদ্রতলে বিচরণ করে। আমাদের সুপরিচিত মদ্গুর ও জীয়ল মৎস্যের কণ্টক, চিংড়ীর খড়্গ ও কর্কটের দাড়া আত্মরক্ষার জন্যই উহাদের দেহে যোজিত আছে। কচ্ছপের সর্ব্বাঙ্গ যে কঠিন বর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকে, তাহাও আত্মরক্ষার জন্য।

সেজজাতীয় বৃক্ষ যেমন আমূল কণ্টকাবৃত থাকিয়া আত্মরক্ষা করে, কয়েকজাতীয় ইতর প্রাণীকে সেইপ্রকারে

আত্মরক্ষা করিতে দেখা যায়। আমাদের দেশের সজারু এই শ্রেণীভুক্ত। দেহের লোমগুলি কণ্টকে পরিণত হইয়া ইহাদিগকে এমন নিরাপদ্ করিয়াছে যে, প্রবল শত্রু ইহাদের সম্মুখীন হইতে ভীত হয়।
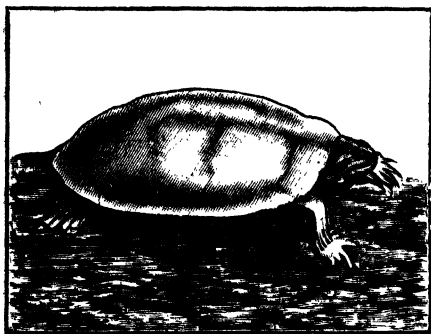
কচ্ছপ।

ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গগুলি নিরীহ প্রাণী হইলেও, ইহাদের শত্রুসংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। পক্ষিগণ কীট-পতঙ্গের পরম শত্রু। কয়েকজাতীয় পক্ষী কেবল কীট ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে। এই উপদ্রবের শান্তির জন্য কীটপতঙ্গের দেহেও নানা সুব্যবস্থা দেখা যায়। বোল্‌তা ও মধুমক্ষিকার দেহে যে বিষাক্ত হূল সংযুক্ত থাকে, তাহা উহাদের আত্ম-রক্ষারই অস্ত্র। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি কীট শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলেই দেহ হইতে যে দুর্গন্ধ রস নির্গত করে, তাহাকেও উহাদের আত্মরক্ষার সহায় বলা যাইতে পারে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে উজ্জ্বল আলোকে যে সকল কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে এইপ্রকার দুর্গন্ধরসস্রাবী কীট (গাঁধী পোকা) কখন কখন দেখা যায়। দেহে তীব্র

দুর্গন্ধের আভাস পাইলেই কোন কীটভুক্ প্রাণী তাহাদের নিকটবর্ত্তী হয় না।

নিঃসহায়ের পরম সহায় এবং অগতির গতি পরমেশ্বর যে সকল উপায়ে তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানগুলিকে রক্ষা করেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

প্রশ্নাবলী।

১। গবাদি, অস্ত্রাঘাত,—এই দুইটি পদের সন্ধি বিচ্ছেদ কর।

২। যোদ্ধার বেশ, রসস্রাব করে যে,—এই দুইটিকে সমস্ত-পদের আকারে প্রকাশ কর।

৩। সম্মুখীন, নিম্নমুখ, আবিষ্ট,—এইগুলি কিপ্রকারে সিদ্ধ হইল বল।

৪। পরিচিত দুইটি বৃক্ষের উদাহরণ দিয়া সেগুলি কি প্রকারে আত্মরক্ষা করে বুঝাইয়া দাও।

বাদুড়।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বাদুড় দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মদেশ এবং সিংহল-দ্বীপেও কয়েকজাতীয় বাদুড় দেখা গিয়াছে। পক্ষীর ন্যায় উড়িতে দেখিয়া আমরা ইহাদিগকে পক্ষিশ্রেণীভুক্ত প্রাণী মনে করি বটে, কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বাদুড়কে পক্ষী বলেন না। পক্ষীর ন্যায় ইহারা অণ্ডজ নহে। স্তন্যপায়ী পশুদিগের ন্যায় ইহারা পূর্ণাবয়ব হইয়া প্রসূত হয় এবং দন্ত দ্বারা খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া আহার করে, অথচ পক্ষীদিগের ন্যায়ই উড়িয়া বিচরণ করে। জরায়ুজ বা স্তন্য-পায়ী পশুর অনেক লক্ষণই বাদুড়দিগের দেহে বিদ্যমান দেখিয়া ইহারা স্তন্যপায়ীদিগের জাতিভুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, আংশিকভাবে পশু ও পক্ষী উভয়েরই লক্ষণ দেহে ধারণ করিয়া বাদুড় একটি অদ্ভুত প্রাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাদুড়।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদিগের মধ্যে অধিকাংশই চতুষ্পদ। মানুষ এবং কয়েকজাতীয় বানর প্রভৃতি যে কয়েকটি স্তন্যপায়ীকে দ্বিপদ দেখা যায়, তাহাদিগের দুইখানি হস্ত আছে;

এই হস্তদ্বয় পশুদিগের সম্মুখের পদদ্বয়ের স্থান অধিকার করিয়া আছে বলা যাইতে পারে। বাদুড়ের চারিখানি পদ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। ইহাদের পশ্চাতের পদযুগলে পাঁচটি করিয়া সুন্দর নখ আছে, দেখিলেই দেহের এই অংশকে পদ বলিয়া বুঝা যায়; কিন্তু সম্মুখের পদযুগল এপ্রকার অবস্থায় থাকে যে, তাহা দেখিলে হঠাৎ পদ বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। ইহার অস্থিসংস্থান ইত্যাদি মানবের হস্তদ্বয়েরই অবিকল অনুরূপ। এই জন্য প্রাণি-তত্ত্ববিদ্‌গণ বাদুড়ের সম্মুখের এই দুই অঙ্গকে হস্তই বলিয়া থাকেন। মানব বা বানরের হস্তে যেমন পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি থাকে বাদুড়ের প্রত্যেক হস্তে অবিকল সেই-প্রকার পাঁচটি অঙ্গুলি আছে; তবে মানুষের হস্তের অঙ্গুলি যেমন ক্ষুদ্র,

মানুষের হাতের অস্থি।

বাদুড়ের অঙ্গুলিগুলি সেপ্রকার নহে। দেহের অনুপাতে ইহাদের অঙ্গুলিগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং এই অঙ্গুলিগুলিই একপ্রকার নাতিস্থূল কৃষ্ণ চর্ম্মে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া বাদুড়ের পক্ষের উৎপত্তি করে। সুতরাং দেখা
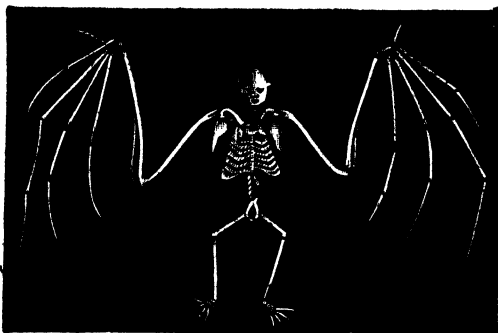
বাদুড়ের কঙ্কাল।

যাইতেছে, দুই করের অঙ্গুলিগুলিই চর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া বাদুড়ের দুইখানি ডানার উৎপত্তি করিয়াছে। হংসপ্রভৃতি জলচর প্রাণীর পদের অঙ্গুলিগুলি সূক্ষ্ম চর্ম্মে পরস্পর সংযুক্ত থাকে, ইহারা সেই অনতিপ্রশস্ত জোড়া অঙ্গুলির সাহায্যে জলে আঘাত দিয়া সন্তরণ দেয়। বাদুড়েরাও তাহাদের চর্ম্মাচ্ছাদিত সুদীর্ঘ অঙ্গুলি দ্বারা বায়ু ঠেলিয়া উড়িয়া বেড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাদুড়ের ডানাদ্বয় প্রকৃতপ্রস্তাবে পক্ষীর পক্ষযুগলের অনুরূপ নহে। ইহাদের হস্তদ্বয়ের

অঙ্গুলিগুলিই দীর্ঘ হইয়া ও সূক্ষ্ম কৃষ্ণচর্ম্মে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দুইখানি কৃষ্ণবর্ণ ডানার আকার গ্রহণ করিয়াছে।

পক্ষীর দেহ ও পক্ষদ্বয় যেপ্রকার পালকে আবৃত থাকে, বাদুড়ের দেহের কোন অংশেই সেপ্রকার পালক দৃষ্ট হয় না। ইহাদের গ্রীবার উপরিভাগ এবং মস্তক প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ লোমে আবৃত থাকে, অপর অংশে কেবল বাদামী বর্ণের লোমেরই আধিক্য দেখা যায়।
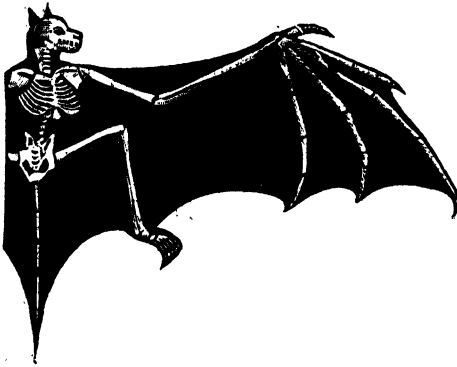
বাদুড়ের ডানা ও তাহার অস্থি।

পক্ষীদিগের দন্ত নাই, কিন্তু বাদুড়ের মুখবিবরে সুন্দর শ্বেত দন্তশ্রেণী সজ্জিত দৃষ্ট হয়। এই সকল দন্ত দ্বারা ইহারা আহার্য্য কর্ত্তন ও চর্ব্বণ করে। কুক্কুরাদি সাধারণ পশুদিগের ন্যায়ই ইহাদের সুগঠিত কর্ণ নাসিকা ও জিহ্বা আছে। বাদুড়ের মুখের আকৃতি অনেকাংশে শৃগালের মুখের অনুরূপ।

আমাদের দেশের বাদুড়ের দেহ সাধারণতঃ আট হইতে এগার ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। পক্ষ বিস্তৃত করিলে তাহার প্রসর কখন কখন দেড় হস্ত পরিমিতও হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণ পক্ষীদিগের তুলনায় বাদুড়ের পক্ষদ্বয়ের

প্রসর অত্যন্ত অধিক; এই কারণে ইহারা অনায়াসে বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া দীর্ঘকাল উড়িতে পারে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বাদুড় অণ্ডজ প্রাণী নহে; সাধারণ পশুদিগের ন্যায় ইহারা পূর্ণাবয়ব গ্রহণ করিয়া জন্মে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; ইহারা শৈশবে পশুদিগেরই ন্যায় মাতৃস্তন্য পান করিয়া প্রাণ ধারণ করে। আমাদের দেশের বাদুড় প্রায়ই এককালে একটির অধিক শাবক প্রসব করে না। পক্ষীর ন্যায় প্রাণীর জীবনের এই-প্রকার বিবরণ অতীব বিস্ময়কর। যে সকল প্রাণী উড্ডয়নক্ষম তাহাদের মধ্যে এক বাদুড়ই শাবক প্রসব করে এবং স্তন্যদানে শাবককে পালন করে।

মাংসাশী ও ফলভোজী এই দুই শ্রেণীর বাদুড়ই ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয়, কিন্তু বঙ্গদেশে ফলভোজী বাদুড়েরই প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার সুস্বাদু ফল ইহাদের অতি প্রিয় খাদ্য। বট ও অশ্বত্থের পক্ক ফল ইহারা সানন্দে ভক্ষণ করে। সুপারি পক্ক হইতে আরম্ভ হইলে সূর্য্যাস্তের পরে ইহারা দলে দলে সুপারি-বাগানের দিকে যাত্রা করে এবং সমস্ত রাত্রি সুপারি ভক্ষণ করে। রাত্রিশেষে আবাসবৃক্ষে প্রত্যাগমন-কালেও সুপারি ত্যাগ করিতে চাহে না; সকলেই দুই-একটি সুপারি মুখে করিয়া লইয়া আইসে। সুপারির বহিরাবরণ অর্থাৎ ছালই বাদুড়ের খাদ্য, ইহারা বীজটি

ভক্ষণ করে না। এই কারণে যে বৃক্ষে বাদুড় বাস করে, তাহার তলদেশে বহু সুপারি পতিত থাকে। অনেক দরিদ্র ব্যক্তি এই সকল সুপারি সংগ্রহপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হয়।

বাদুড় নিশাচর প্রাণী। গ্রামের প্রান্তস্থিত নিভৃতস্থানে যে সকল তিন্তিড়ী ও বংশবৃক্ষ থাকে, তাহাই ইহাদের প্রিয় আবাসস্থান। এই সকল বৃক্ষেরই শাখা আশ্রয় করিয়া ইহারা দিবস যাপন করে, কিন্তু পক্ষীর ন্যায় শাখায় উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিতে পারে না। পশ্চাতের পদের নখ এবং হস্তের সেই দীর্ঘ অঙ্গুলির নখ শাখায় সংলগ্ন রাখিয়া বাদুড়েরা নিম্নমুখ হইয়া ঝুলিতে থাকে।

বঙ্গদেশে একএকটি বৃক্ষে দিবসে শত শত বাদুড়কে এইপ্রকারে লম্বিত থাকিতে দেখা যায়। সন্ধ্যা হইলে, ইহারা আর নিশ্চেষ্টভাবে থাকিতে পারে না, তখন আহারান্বেষণে সকলেই চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয় এবং আবার উষার প্রাক্কালে নির্দ্দিষ্ট আবাসবৃক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করে। প্রত্যাগমনের পরে প্রায়ই ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘোর বিবাদ হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক বাদুড়ই সর্ব্বোচ্চ শাখার নিরাপদ্ অংশে আশ্রয়গ্রহণের জন্য বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে পরিভ্রমণ আরম্ভ করে। কিন্তু যে সকল বাদুড় পূর্ব্বে সেই নিরাপদ্ স্থানগুলি অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারা কোনক্রমেই নবাগত বাদুড়দিগকে পার্শ্বে স্থান

দিতে ইচ্ছা করে না। এই ব্যাপার-অবলম্বনে শেষে বাদুড়-দিগের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। দূর হইতে এই সংগ্রামকারী বাদুড়দিগের চীৎকার শ্রুত হয়।

পুরাতন মন্দির বা জনশূন্য ভগ্নগৃহের অন্ধকারময় কক্ষে যে সকল চাম্‌চিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাও বাদুড়-জাতীয় প্রাণী। চাম্‌চিকা বাদুড়ের ন্যায় বৃহদাকারবিশিষ্ট হয় না। ইহাদের মধ্যে কয়েকশ্রেণী ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গও ভক্ষণ করে।

প্রশ্নাবলী।

১। বাদুড় পক্ষিশ্রেণীভুক্ত নয় কেন? মানুষের হস্তের সহিত বাদুড়ের পক্ষদ্বয়ের সাদৃশ্য কোথায়?

২। স্তন্যদান, অনতিপ্রশস্ত, অণ্ডজ, নিশাচর, নিশ্চেষ্ট,—এই গুলির ব্যাস-বাক্য বল।

৩। "সংযুক্ত" এই শব্দে যে উপসর্গ আছে তাহার স্থানে অপর উপসর্গ যোগ করিয়া অন্ততঃ পাঁচটি নূতন শব্দ রচনা কর এবং সেগুলির অর্থ লিখ।

পদ্যাংশ।

জীবন-সঙ্গীত।

ব'লো না কাতরস্বরে— বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন ;
দারা, পুত্র, পরিবার, তুমি কার কে তোমার—
বলে' জীব ক'রো না ক্রন্দন।
মানব-জীবন সার, এমন পাবে না আর ;
বাহ্য দৃশ্যে ভুলো না রে মন।
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয় ;
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।
ক'রো না সুখের আশ, প'রো না দুঃখের ফাঁস
জীবনের উদ্দেশ্য তা' নয় ;
সংসারে সংসারী সাজ, কর নিত্য নিজ কাজ ;
ভবের উন্নতি যাতে হয়।

দিন যায়, ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির।
সহায় সম্পদ্ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর।
সংসার-সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হ'ও না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান্, যায় যাবে যাক্ প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
মনোহর মূর্ত্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর ;
অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা ক'রে হ'ও না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্য্যে হও রত,
একমনে ডাক ভগবান্।
সঙ্কল্প-সাধন হবে, ধরাতলে কীর্ত্তি র'বে,
সময়ের সার—বর্ত্তমান্।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন,
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথে লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধ'রে,
আমরাও হব বরণীয়।
সময়-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে,
আমরাও হব হে অমর।

সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
ক'রো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গন-মাঝে।
সঙ্কল্প ক'রেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
রত হ'য়ে নিজ নিজ কাজে।

প্রশ্নাবলী।

১। প্রাতঃস্মরণীয়, সমরাঙ্গন, দারা, কীর্ত্তিধ্বজা,—এই কয়টি পদের অর্থ কি?

২। কাতরস্বর, ধরাতল, সময়-সাগর-তীর,—এই গুলির সমাস-বাক্য বল।

৩। "সময়-সাগর-তীরে.........হব হে অমর।"—এই অংশের অর্থ সহজ ভাষার প্রকাশ কর।

৪। যশোদ্বার—ইহার সন্ধিবিচ্ছেদ কর ও সন্ধির সূত্র বল, এবং এই সূত্রানুযায়ী অপর দুইটি পদকে সন্ধিযুক্ত কর।

রাজার রাজা।

বাদশাহ যবে বন্দনারত
ছিলেন ভজনাগারে,
সন্ন্যাসী আসি' দর্শন-আশে
দাঁড়ায়ে রহিল দ্বারে।

উপাসনা-শেষে যাচিলা নৃপতি
ভকতি-পূরিত স্বরে,
"দাও প্রভু মোরে ধন সম্পদ
বিভব, করুণা ক'রে।"

বাহিরে আসিতে দেখিলেন চাহি'
ভস্মভূষিত-কায়
সন্ন্যাসী এক দ্বার হ'তে তাঁর
ধীরে ফিরে চলে' যায়।

শুধাইলা তাঁরে মধুর বচনে
"ওগো সন্ন্যাসী, কেন
আসি' এসময়ে রাজপুরী মাঝে
ফিরে' চলে' যাও হেন?

সাধু সজ্জন, ভিক্ষুক হেথা
হয় না বিফল-আশ,
যাচ্ঞা তোমার জানাইলে মোরে
পূরাইব অভিলাষ।”

সন্ন্যাসী কহে, “জয় হোক তব,
ধন্য রাজাধিরাজ!
অর্থ-আশায় এ রাজভবনে
এসেছিনু আমি আজ।

বাসনা আমার— অনাথ আতুর
আশ্রয়-হীন লাগি’
আশ্রম এক করিব স্থাপন
নগরে ভিক্ষা মাগি’।

দেখিলাম হেথা— বিশাল রাজ্য
আছে যাঁর পদানত,
মাগিছেন ধন সেই মহীপতি—
ভিখারী আমার মত!

কে পূরাবে তবে আকাঙ্ক্ষা মোর;
যা কিছু অভাব আছে—
যে রাজার দ্বারে ভিক্ষুক রাজা
মাগিব তাঁহারি কাছে।”

প্রশ্নাবলী।

১। এই পদ্যটির গল্পাংশ সহজ ভাষায় বিবৃত কর।

২। মহীপতি—এই পদটির অর্থ আর একটি সমাস-যুক্ত পদদ্বারা প্রকাশ কর।

৩। কবি এই গল্পটি দ্বারা কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

অপূর্ব্ব গুরুভক্তি।

অবন্তীনগরে দ্বিজ নাম সান্দীপন,
তাঁর স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন ;
এক শিষ্যে দ্বিজ গবী কৈলা সমর্পণ,
গুরুভক্ত শিষ্য তার করেন রক্ষণ।

কত দিনে বলে গুরু, "শুন শিষ্যবর,
বড় পুষ্ট দেখি যে, তোমার কলেবর ;
কিবা খাও, কোথা পাও, কহ সত্য বাণী।"
শুনিয়া বলেন শিষ্য, করি যোড় পাণি ;
"গাভীর দোহন-অন্তে পিয়ে বৎসগণ,
পরে পান করি দুগ্ধ করিয়া দোহন।"

গুরু বলে, "এতদিনে বুঝিনু সকল ;
এই হেতু বৎসগণ হইল দুর্ব্বল !
আর কভু তুমি না করিবে হেন কাজ ;
ধেনু দুহি খাও তুমি, নাহি ভয় লাজ !"

গুরুর আজ্ঞায় শিষ্য গবী ল'য়ে যায়।
কত দিন পরে গুরু জিজ্ঞাসে তাহায় ;—
"উচিত কহিব শিষ্য, না হইও রুষ্ট,
পুনশ্চ তোমারে দেখি বড় হৃষ্টপুষ্ট ;
ধেনুদুগ্ধ পুনঃ বুঝি তুমি কর পান !"
শিষ্য বলে, "গোঁসাই করহ অবধান,—
যেই দিন হৈতে তুমি কৈলে নিবারণ,
ভিক্ষা মাগি নিত্য, করি উদর পূরণ।"
গুরু বলে, "ভিক্ষা করি, পূরহ উদর !
এবে ভিক্ষালব্ধ ধন হইবেক মোর।"

এত শুনি, গবী লৈয়া গেল শিষ্যবর।
জিজ্ঞাসিলা গুরু কত দিবস অন্তর,
"শিষ্য, এবে বড় পুষ্ট দেখি তব কায়,
কি খাইয়া আছ, তাহা কহ ত আমায় ?"
শিষ্য বলে, "গবী রাখি অরণ্য-ভিতরে,
রক্ষক রাখিয়া আমি যাই গ্রামান্তরে ;

দিবসের যত ভিক্ষা দিই তব ঘরে,
নিশায় মাগিয়া ভিক্ষা, ভরি এ উদরে।”
হাসিয়া বলিলা গুরু, “এ কোন্ বিচার ?
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার !
রাত্রি দিবা যত ভিক্ষা, আনি দিবে মোরে।”
এত শুনি গবী লৈয়া গেল বন ঘোরে।

ক্ষুধায় আকুল তনু, ভ্রমে বনে বন,
অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ।
নয়ন দুর্ব্বল হৈল, শীর্ণ হৈল কায়,
দেখিতে না পায়, তবু গোগণ চরায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, দেখ, দৈবের লিখন,
নিরুদক কূপমধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ !

সমস্ত দিবস গেল, হৈল সন্ধ্যা কাল ;
ফিরিয়া আইল গৃহে গো-বৎসের পাল।
শিষ্যে না দেখিয়া গুরু দুঃখিত-অন্তর,
অন্বেষণে গেলা নিজে অরণ্য-ভিতর।
“কোথা উদ্দালক !” বলি, ডাকে দ্বিজবর ;
উদ্দালক বলে, “আমি কূপের ভিতর।”
গুরু বলে, “কূপ-মধ্যে পড়িলা কি মতে ?”
উদ্দালক বলে, “চক্ষে না পাই দেখিতে,

অর্কপত্র খেয়ে অন্ধ হইল নয়ন।”
—শুনিয়া, আচার্য্য তারে কহেন তখন,—
“দেব-বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুইজন;
শীঘ্র কর শিষ্য তুমি তাঁদের স্মরণ।”
এত শুনি, শিষ্য বহু স্তবন করিল,
সেইক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল!
কূপ হৈতে উঠি, নমে গুরুর চরণ,
আশীষ করেন গুরু হরষিত-মন।

আরুণি-নামেতে শিষ্য ছিল একজন;
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা করেন তখন,—
“ধান্যক্ষেত্রে জল সব যাইছে বহিয়া,
যতনপূর্ব্বক জল বাঁধি রাখ গিয়া।”
আজ্ঞামাত্র শিষ্যবর করিল গমন,
ক্ষেত্রে বাঁধিবারে জল করিল যতন,
কিন্তু বাঁধ ভাঙ্গি জল ধায় বেগভরে;
আপনি শুইল শিষ্য বাঁধের উপরে!

সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী,
না আইল শিষ্য, গুরু চলিলা আপনি।
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া, ডাক দিলা দ্বিজবর;
শিষ্য বলে, “শুয়ে আছি বাঁধের উপর—

বহু যত্ন করিলাম, রহে না বন্ধন,
আপনি শুইমু বাঁধে, তাহার কারণ।”
শুনিয়া বলিলা গুরু, “আইস উঠিয়া ;”
উঠি শিষ্য গুরুপদে প্রণমিল গিয়া।
আশীষ করিলা গুরু, হউক কল্যাণ,
“চারি বেদে সব শাস্ত্রে হো’ক তব জ্ঞান।”
এত বলি বিদায় করিলা দ্বিজবর ;
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর।

প্রশ্নাবলী।

১। পদ্যটির গল্পাংশ সংক্ষেপে গদ্যে প্রকাশ কর।

২। হৃষ্টপুষ্ট, অর্কপত্র, শ্রেষ্ঠভিক্ষা,—এই কয়েকটি পদের সমাস-বাক্য বল।

৩। শিষ্যকে গুরু এই প্রকারে কষ্ট দিয়াছিলেন কেন?

স্পর্শমণি।

(ভক্তমাল)

নদীতীরে বৃন্দাবনে   সনাতন একমনে
জপিছেন নাম।
হেনকালে দীনবেশে   ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন,   "কোথা হ'তে আগমন
কি নাম ঠাকুর ?"
বিপ্র কহে, "কিবা কব   পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি বহুদূর।
জীবন আমার নাম   মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্দ্ধমানে,
এত বড় ভাগ্যহত   দীনহীন মোর মত
নাই কোন খানে।
জমা জমি আছে কিছু   ক'রে আছি মাথা নীচু,
অল্প স্বল্প পাই।
ক্রিয়া কর্ম্ম যজ্ঞ যাগে,   বহু খ্যাতি ছিল আগে,
আজ কিছু নাই।

আপন উন্নতি লাগি, শিবকাছে বর মাগি,
করি আরাধনা ;
একদিন নিশিভোরে, স্বপ্নে দেব কন মোরে,
"পূরিবে প্রার্থনা ;
যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধর দুটি পায়।
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি কাছে আছে জেনো,
ধনের উপায়।"
শুনি কথা সনাতন, ভাবিয়া আকুল হন,
"কি আছে আমার ?
যাহা ছিল সে সকলি, ফেলিয়া এসেছি চলি,
ভিক্ষামাত্র সার।"
সহসা বিস্মৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে,—
"ঠিক্ বটে ঠিক !
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশ মাণিক।
যদি কভু লাগে দানে,— সেই ভেবে ওই খানে,
পুতেছি বালুতে।
নিয়ে যাও, হে ঠাকুর, দুঃখ তব হোক্ দূর,
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।"
বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি, খুঁড়িয়া বালুকারাশি,
পাইল সে মণি।

লোহার মাদুলি দুটি, সোণা হ'য়ে উঠে ফুটি,
ছুঁইল যেমনি।
ব্রাহ্মণ বালুর পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে,
ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা কল্লোলগানে চিন্তিতের কাণে কাণে
কহে কত কি যে।
নদীপারে রক্তচ্ছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচল।
তখন ব্রাহ্মণ উঠে, সাধুর চরণে লুঠে,
ঝরে অশ্রুজল,
"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি,
তাহার খানিক
মাগি আমি নত শিরে ;"— এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মাণিক।

প্রশ্নাবলী।

১। পদ্যে বিবৃত গল্পটি গদ্যে প্রকাশ কর।

২। স্পর্শমণি কাহাকে বলে? লোকে ইহাতে কি বিশেষ গুণের আরোপ করে?

৩। দীনহীন, ভাগ্যহত,—এই দুইটি পদের সমাস কি? সমাস-বাক্য লিখ।

৪। শির নত যাহার, নদীর তট,—এই দুইটি বাক্যকে এক একটি সমস্ত পদ দ্বারা প্রকাশ কর।

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে,
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী,
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী,—
"একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি?
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার,
ভয় করি, কি জানি কে দিবে ফেরফার।"

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
"বুঝহ ঈশ্বরী, আমি পরিচয় করি।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি;
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত;
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম;

অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন।
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
গঙ্গা নামে সতা, তার তরঙ্গ এমনি,
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে;
না মরে পাষাণবাপ দিলা হেন বরে।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই,
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই।"

পাটনী বলিছে, "আমি বুঝিনু সকল,
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল।
শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা বল?"
দেবী কন, "দিব, আগে পারে ল'য়ে চল।"
যার নামে পার করে ভব-পারাবার,
ভাল ভাগ্য পাটনী তাহারে করে পার!

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ,
কিবা শোভা, নদীতে ফুটিল কোকনদ!

পাটনী বলিছে, "মা গো, বৈস ভাল হ'য়ে,
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে ল'য়ে!"
ভবানী কহেন, "তোর নায়ে ভরা জল,
আল্‌তা ধুইবে, পদ কোথা থুব বল?"
পাটনী বলিছে, "মা গো, শুন নিবেদন,
সেঁউতি-উপরে রাখ ও রাঙা চরণ।"

পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে,
রাখিলা ছুখানি পদ সেঁউতি-উপরে।
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে,
সেঁউতি হইল সোণা দেখিতে দেখিতে।
সোণার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়;
এ ত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়!

তীরে উত্তরিল তরী; তারা উত্তরিলা,
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা।
সেঁউতি লইয়া কক্ষে, চলিল পাটনী;
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি।
সভয়ে পাটনী কহে, চক্ষে বহে জল,—
"দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল।

হের দেখ, সেঁউতিতে থুয়েছিলে পদ;
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ!
ইহাতে বুঝিনু, তুমি দেবতা নিশ্চয়;
দয়ায় দিয়াছ দেখা, দেহ পরিচয়।
তপ জপ জানি নাহি, ধ্যান জ্ঞান আর;
তবে যে দিয়াছ দেখা, দয়া সে তোমার।
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য-উদয়,
সেই দয়া হ'তে মোরে দেহ পরিচয়।"

ছাড়াইতে নারি, দেবী কহিলা হাসিয়া,
"কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে,
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে।
ভবানন্দ মজুন্দারনিবাসে রহিব,*
বর মাগ মনোমত, যাহা চাহ দিব।"

প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে,—
"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"
"তথাস্তু" বলিয়া দেবী দিলা বর দান,—
"দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।"

* ভবানন্দ মজুমদার কৃষ্ণনগরের রাজবংশের আদি রাজা।

বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘরে যায় ;
পুনর্ব্বার ফিরে চাহে দেখিতে না পায়।
সাত পাঁচ মনে করি, প্রেমেতে পূরিল,
ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল।
তার বাক্যে মজুন্দারে' প্রত্যয় না হয়,
সোণার সেঁউতি দেখি করিলা প্রত্যয়।
আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি,
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি ;
গন্ধে আমোদিত ঘর, নৃত্য বাদ্য গান ;
কে বাজায়, নাচে গায়, দেখিতে না পান।
পুলকে পূরিল অঙ্গ, ভাবিতে লাগিলা ;
হইল আকাশবাণী, অন্নদা আইলা,—
"এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে ;
তোর বংশে মোর দয়া প্রধান থাকিবে।"
আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার,
দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুন্দার।

প্রশ্নাবলী।

১। ভবানন্দ মজুমদার কে ছিলেন ?
২। আকাশবাণী, দণ্ডবৎ—এই দুইটির শব্দগত অর্থ কি ?
৩। ভূতনাথ, গজগমন—এই দুইটি শব্দের ব্যাস-বাক্য লিখ।

৪। অন্নদাদেবী কিপ্রকারে "বিশেষণে সবিশেষ" আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কবিতার একস্থান উঠাইয়া বুঝাইয়া দাও। "কু-কথা" ইহার দুইটি অর্থ কি কি হয়, বল।

শরতের বঙ্গ।

আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জল-ধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে না ক আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাইছে কোয়েল,
তোমার কানন-সভাতে !
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে, জননি,
শরৎকালের প্রভাতে।

জননি, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিক তোমার,
আটি আটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে!
জননি, তোমার আহ্বান-লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে!

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীল-বরণী;
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে;
আসে দলে দলে তব দ্বার-তলে
দিশি দিশি হ'তে তরণী!
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী।

বহিছে প্রথম শিশির-সমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে,
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা,
নবীন জীবন উড়ায়ে।
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন,
হাসিভরা-মুখ তব পরিজন,
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব,
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে।
ছুটেছে সমীর কুটীরে কুটীরে
নবীন জীবন উড়ায়ে।

আয় আয় আয়, আছ যে যথায়,
আয় তোরা সবে ছুটিয়া;
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুঠিয়া;—
ওপার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
'কে কাঁদে ক্ষুধায় ?' জননী শুধায়,
আয় তোরা সবে জুটিয়া;
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুঠিয়া।

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী ;
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত,
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ-জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে, শিশিরে, কুসুমে, ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

প্রশ্নাবলী।

১। শারদ, মধুর, শিশির-সমীর, অবনী, হিরণ—এই কয়েকটি পদের অর্থ বল।

২। মাতার কণ্ঠ—এই বাক্যটিকে সমাসযুক্ত পদে পরিণত কর।

৩। নবীন জীবন উড়ায়ে— ইহার অর্থ কি ?

৪। নিজের ভাষায় শরৎকালের বর্ণনা কর।

রসাল ও স্বর্ণলতিকা।

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে,—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে!
নিদারুণ তিনি অতি
নাহি দয়া তব প্রতি,
তেঁই ক্ষুদ্রকায়া করি সৃজিলা তোমারে!

মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকরভরে তুমি পড় গো হেলিয়া;
হিমাদ্রিসদৃশ আমি,
বনবৃক্ষকুলস্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন-তাপন,
আমি কি গো ডরাই কখন?

দূরে রাখি গাভীদলে,
রাখাল আমার তলে
বিশ্রাম লভয়ে অনুক্ষণ!
শুন, ধনি, রাজকার্য্য দরিদ্র-পালন!
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথগামী জন;—

কেহ অন্ন রান্ধি খায়,
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়,
এ রাজ-চরণে।
শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবনে।

মধুমাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে,
তুমি কি তা জান না, ললনে ?
দেখ মোর ডালরাশি ;
কত পাখী বান্ধে আসি
বাসা এ আগারে।
ধন্য মোর জনম সংসারে !
কিন্তু তব দুঃখ দেখি নিত্য আমি দুখী ;
নিন্দ বিধাতায় তুমি নিন্দ, বিধুমুখি !"

নীরবিলা তরুরাজ, উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ ; গম্ভীর স্বননে
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরবসমরে !

মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ু সহ দর্প বনস্থলে !
উচ্চশির যদি তুমি কুলমানধনে,
করিও না ঘৃণা তবু নীচ-শির জনে ;
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে।

প্রশ্নাবলী

১। এই কবিতায় কবি কি শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

২। নিন্দ, সৃজিলা, নীরবিলা—এই কয়েকটি ক্রিয়াপদকে গদ্যে ব্যবহার করিতে গেলে তাহাদিগের কিরূপ হইবে? বিধুমুখি,—হ্রস্ব-ইকারান্ত হইল কেন?

৩। কুলমানধন, রাজ-চরণ, যমদূতাকৃতি, মধুকর—এই কয়েকটি পদের ব্যাসবাক্য বল।

বৃথা বস্তু।

বৃথা সে সুদুরারোহ-মহীরুহ-ফল,
বঞ্চিত যাহার স্বাদে মনুজ সকল।
বৃথা সে অমৃত-ভাষ-ভাষিণী রসনা,
না হয় যাহাতে সত্য-মহিমাঘোষণা।
বৃথা সে কৃপণকর-তল-স্থিত ধন,
জগতের হিত যায় হয় না কখন।
অর্জ্জিত বিদ্যায় বল কিবা ফল তার,
বিদ্যা-অনুরূপ নহে ব্যবহার যার।
বল বল সে বলীকে বলী কেবা কয়,
কার্য্যকালে যার বল কার্য্যকারী নয়?
বিবেক বিজ্ঞানে বল কিবা ফল তার,
সৎক্রিয়া-সাহস নাই মনেতে যাহার?
বল তার জীবনেতে কিবা প্রয়োজন,
জীবনসাফল্য-লাভে বিমুখ যে জন?

প্রশ্নাবলী

১। সুদুরারোহ, অমৃত-ভাষ-ভাষিণী, জীবনসাফল্য-লাভ—এই তিনটি শব্দের ব্যাসবাক্য লিখ।

২। মহীরুহ ও মনুজ—পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি?

৩। বৃক্ষের ফল, বলশালীর বল, সযত্নে সঞ্চিত অর্থ, কিপ্রকারে সার্থক হয়?

সাহিত্য-সন্দর্ভ।

দ্বিতীয়ার্দ্ধ।

অশোক।

প্রিয়দর্শী অশোকের তুল্য ত্যাগশীল ভূপতি জগতের ইতিহাসে বিরল। ধর্ম্ম ও সুনীতির বহুল প্রচার এবং মানবসমাজের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলসাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এইজন্য সাইবেরিয়া হইতে সিংহলপর্য্যন্ত এসিয়া মহাদেশের সমগ্র ভূভাগে গৃহে গৃহে তাঁহার যশোগাথা অদ্যাপি পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের জন্য হিমগিরি হইতে সিংহলপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বাংশে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে পারস্য, এসিয়ামাইনর, তিব্বত, চীন প্রভৃতি নানা দেশে তিনি বহু প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিবিধ মঙ্গলানুষ্ঠানের নিমিত্ত অশোক মুক্তহস্তে অর্থ-ব্যয় করিতেন। তাঁহার দানে আতপ-তাপিত পথিকের জন্য

পথিপার্শ্বে ছায়াতরু রোপিত ও বিশ্রামভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাঁহার অর্থে অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত মানব ও গৃহপালিত পশুদিগের নিমিত্ত দেশের সর্ব্বাংশে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

অতুলপ্রতাপান্বিত ভূপতি হইয়াও তিনি ভোগবিলাস বিসর্জ্জন করিয়া জীবনের এক সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি ভিক্ষুর ন্যায় সামান্য কাষায়বস্ত্র পরিধান করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক ইৎসিং অশোকের মৃত্যু প্রায় সহস্র বৎসর পরে ভারতভ্রমণ-সময়ে ভিক্ষুবেশধারী প্রিয়দর্শীর খোদিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

তাঁহার পুণ্য জীবনের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ধর্ম্মের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ-বশতঃ তিনি তাহার উন্নতিবিধানের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। পুত্র, কলত্র, বিত্ত, রাজপদ, এমন কি, প্রাণ অপেক্ষাও ধর্ম্ম তাঁহার প্রিয়তর ছিল। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্র মহেন্দ্র ও প্রিয়তমা দুহিতা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে প্রেরণ করেন। রাজকুমার ও রাজ-কুমারী যাবজ্জীবন ভিক্ষুধর্ম্ম আচরণ করিয়া ধর্ম্ম ও সুনীতির প্রচার করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল বিস্তারের নিমিত্ত তিনি অজস্র অর্থ দান করিতেন বলিয়া, তাঁহার অপূর্ব্ব দানশীলতা-সম্বন্ধে অনেক

আখ্যান প্রচলিত আছে। তাহাদের একটি এইরূপ,—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকল্পে অশোক দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনি রাজকার্য্য হইতে একরূপ অবসর গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ধর্ম্মার্থে তাঁহার নয় কোটি ষাট লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয়িত হইয়াছে; সেইজন্য তখনও তিনি প্রতিদিন রাজভাণ্ডার হইতে প্রভূতপরিমাণ রজত ও কাঞ্চন "কুক্কুটারাম"-নামক প্রসিদ্ধ ভিক্ষুনিবাসে পাঠাইয়া দিতেন। এই সময়ে তাঁহার পৌত্র সম্পদি যুবরাজ ছিলেন। মন্ত্রিবর্গ তাঁহাকে জানাইলেন যে, মহারাজ অশোকের অমিত দানে রাজভাণ্ডার অবিলম্বে শূন্য হইবে এবং তিনি অর্থবল-হীন হইয়া অদূর ভবিষ্যতে এমন হীনাবস্থাপন্ন হইবেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে কোনক্রমেই তাঁহার জয়ী হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

যুবরাজ এই কথা শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং রাজার আদেশানুসারে অর্থব্যয় করিতে কোষাধ্যক্ষকে নিষেধ করিলেন। এইরূপে আর অর্থলাভের আশা না থাকিলেও অশোক সঙ্কল্পিত দানকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি তাঁহার ব্যবহার্য্য স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রগুলি একটি একটি করিয়া সাধু-নিবাসে পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার অন্তঃপুরের কাঞ্চন, রৌপ্য, এমন কি, লৌহপাত্রগুলিও নিঃশেষ হইল।

যখন অশোকের দান করিবার আর কিছুই রহিল না, তখন তিনি শোকসন্তপ্তচিত্তে মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অমাত্যগণ, এই রাজ্যের রাজা কে?"

সচিবগণ অবনতমস্তকে উত্তর করিলেন,—"প্রভো, আপনিই এই রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর।"

মন্ত্রিগণের এইরূপ প্রতিবচন শ্রবণ করিয়া অশোক অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, তোমরা শিষ্টাচার-প্রদর্শনের জন্য আর আমাকে রাজা বলিয়া কীর্ত্তন করিও না, আমি রাজগৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। তোমরা একবার চাহিয়া দেখ, ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিবার জন্য এই অর্দ্ধখণ্ড আমলক ব্যতীত সম্রাট্ অশোকের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।"

এই বলিয়াই সম্রাট্ সেই আমলকখণ্ড সাধুদিগকে প্রদান করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—"এই আমলকখণ্ডই ভিক্ষুসঙ্ঘে আমার শেষ দান। আপনারা সকলে এই শেষ দানের অংশ গ্রহণ করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। রাজশ্রী ও রাজশক্তি আমাকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছে। আমার স্বাস্থ্য ভগ্ন এবং শরীর শীর্ণ হইয়াছে; আত্মীয়গণের প্রণয় ও স্বজনবর্গের সাধু ব্যবহারে আমি আর অধিকারী নহি।"

ধর্ম্মভীরু রাজার এইরূপ পরিতাপবাক্যেও মন্ত্রিগণ রাজকোষ হইতে ধর্ম্মার্থে আর অর্থব্যয়ের কোন ব্যবস্থা করিলেন

না। কিন্তু অশোকের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, প্রজাগণের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য যে ব্যয়, তাহা অপব্যয় নহে। ঐহিক ঐশ্বর্য্য অচিরস্থায়ী, ধর্ম্মই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের পরম আশ্রয়। এইরূপ বিশ্বাসবশতঃ তিনি রাজকোষ হইতে সদ্ব্যয়ের জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

একদিন তিনি তাঁহার প্রধান সচিব রাধাগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মন্ত্রিবর, এই রাজ্যের অধীশ্বর কে ?"

রাধাগুপ্ত যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক সবিনয়ে নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ, আপনিই এই রাজ্যের প্রভু।"

মন্ত্রীর তাদৃশ প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া অশোক ধীরকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"আমি যদি এই রাজ্যের অধীশ্বর, তবে এই বিবিধ ধনরত্নশালিনী ভূতধাত্রী ধরণী আমি ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিলাম। জলপ্রবাহের ন্যায় চঞ্চল ঐশ্বর্য্য আমার অভিলষিত নহে, ইন্দ্রত্ব বা ব্রহ্মত্ব আমি কামনা করি না। সাধু-গণের চিত্তের সদাবাঞ্ছিত শান্তিই আমার একমাত্র কাম্য ধন। এই দান সেই অভীষ্টসাধনে আমার আনুকূল্য করুক।"

এই কথা বলিয়া তিনি যথারীতি দানপত্র স্বাক্ষরযুক্ত করিলেন। কথিত আছে যে, মহামতি অশোকের সঙ্কল্পিত দানের অবশিষ্ট চল্লিশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করিয়া মন্ত্রিবর্গ অশোকদত্ত রাজ্য পুনর্ব্বার সম্পাদির জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন।

সোরাব্ ও রোস্তম্।*

(অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি)

পারস্যের পূর্ব্বপ্রান্তে সিস্তান্ নামে একটি পার্ব্বত প্রদেশ অবস্থিত; দিগন্তব্যাপী মরুভূমি ইহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। দূরে স্থানে স্থানে দুই একটি ক্ষুদ্র নদী মন্দস্রোতে প্রবাহিতা। নদীতীরবর্ত্তী ভূমি কিঞ্চিৎ উর্ব্বরা, তৎপরে দিগন্তবিস্তৃত বালুকারাশি কেবল ধূ ধূ করিতেছে। গ্রীষ্ম-কালে এই প্রদেশে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয়। মধ্যাহ্নে বায়ুর অগ্নিস্পর্শ সহ্য করিতে না পারিয়া পশুপক্ষিগণ নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করে; এই সময়ে তাহাদিগকে মৃত বলিয়াই ভ্রম হয়। মধ্যাহ্নে গৃহস্থদিগকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিতে হয়।

---

* এই করুণ কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। কর্ণেল সার জন্ মালকলন তাঁহার প্রসিদ্ধ "পারস্যের ইতিহাসের" চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত করিয়াছেন। অমর কবি ফার্দৌসি এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়া একটি সুন্দর কাব্য লিখিয়াছেন; আজও তাহা "সাহ-নামার" অন্তর্গত আছে। ইংরাজ-কবি মাথু আর্নল্ডের "সোরাব্-রোস্তম্" নামক খণ্ড-কাব্যটিও এই কাহিনী অবলম্বনে লিখিত।

একটি জলাভূমির প্রান্তবর্ত্তী নিভৃত স্থানে পারস্যের প্রধান বীর রোস্তম্ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উপবিষ্ট আছেন। পারস্যরাজ কায়কাউস্ এককালে তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন এবং সমস্ত রাজ্যের ভার তাঁহার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতায় পারস্যরাজের মনে এক্ষণে বিদ্বেষ ও আশঙ্কার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য রোস্তম্ ক্ষুব্ধ এবং মর্ম্মব্যথিত। তিনি গম্ভীরভাবে মনে মনে কি একটা স্থির করিতেছিলেন। পার্শ্বে সজলনয়নে স্ত্রী তাহ্‌মিনা দণ্ডায়মানা।

স্ত্রী বলিলেন,—"একটিমাত্র ভিক্ষা, তাহাও কি পূর্ণ করিবে না? আমি কিছুই চাহি না, শুধু এই প্রার্থনা করি যে, আমাদের যদি পুত্রসন্তান হয়, তাহা হইলে তাহাকে শৈশবে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইও না।" বলিতে বলিতে তাহ্‌মিনার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি বসনে মুখ আবৃত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রোস্তম্ স্ত্রীর প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।

রাত্রিকাল উপস্থিত হইল; অন্তঃপুররক্ষক সংবাদ দিল যে, প্রস্থানের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত; অশ্ব সজ্জিত হইয়া দ্বারে রহিয়াছে। রোস্তম্ স্বীয় বাহু হইতে স্বনামাঙ্কিত একটি কবচ খুলিয়া তাহ্‌মিনার হস্তে দিয়া বলিলেন,—"পুত্র হইলে, তাহার দক্ষিণ বাহুতে এই কবচটি বাঁধিয়া দিও।"

রোস্তমের নিরুদ্দেশ যাত্রা আরব্ধ হইল।

* * * *

এই ঘটনার পরে বিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। তাতার প্রদেশ দিয়া অক্সাস্ নদী প্রবাহিত; নদীর সৈকতভূমির উপরে তাতারবাসী ও পারসিক উভয় পক্ষের শিবির; মধ্যে বালুকাময় ভূখণ্ডের ব্যবধান; শ্রেণীবদ্ধ লোহিত বর্ণের পটমণ্ডপ মধ্যাহ্নকিরণে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। এক দিকে দীর্ঘ শিরস্ত্রাণধারী অসংখ্য পারসিক সৈন্য; অন্য-দিকে সহস্র সহস্র তুরাণী সৈন্য মেষচর্ম্মে মস্তক আবৃত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত।

এই সময়ে তুরাণী সৈন্যদিগের মধ্য হইতে যুবক বীর সোরাব্ বালুকার উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"পারসিকদিগের মধ্যে যদি এমন কোনও বীর থাকেন, যিনি আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমর্থ, আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।"

সোরাবের এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পারসিক সৈন্যদিগের মধ্য হইতে বৃদ্ধ রোস্তম্ দীর্ঘ দেহ লইয়া সোরাবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি স্নেহপূর্ণ-নয়নে যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; তাহার লাবণ্যপূর্ণ সুন্দর মুখ দেখিয়া বৃদ্ধের হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইল। রোস্তম্ ধীরে ধীরে কহিলেন,—"বৎস, যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হও। আমার পুত্র নাই, তুমি আমার পুত্র হইয়া মৃত্যুকালপর্য্যন্ত আমার সঙ্গে থাক।"

রোস্তমের কথা শুনিয়া সোরাবের হৃদয় এক অস্পষ্ট-ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি রোস্তমের পদতলে নতজানু হইয়া কম্পিতস্বরে কহিলেন,—"বল, সত্য করিয়া বল, তুমি কে? তুমি কি রোস্তম্?"

রোস্তম্ ভাবিলেন যে, তাঁহার নাম শুনিলে নানাচ্ছলে সোরাব্ আর যুদ্ধ করিবে না এবং তাতারে ফিরিয়া গিয়া সাহঙ্কারে বলিবে,—"আমি পারসিক বীরদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলাম; ভয়ে কেহই অগ্রসর হয় নাই।" এই ভাবিয়া রোস্তম্ কর্কশস্বরে বলিলেন,—"আমি রোস্তম্ কি না, তাহা জানিয়া তোমার লাভ কি? উদ্ধত যুবক, তুমি রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহ? তোমার এত স্পর্দ্ধা!"

রোস্তমের বাক্যে সোরাবের সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল। সোরাব্ও বলিলেন,—"এস, তবে যুদ্ধ আরম্ভ কর।"

উভয়ের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিজয়-লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ গ্রহণ করিবেন, কেহই স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে বৃদ্ধ রোস্তমের অস্ত্রে সোরাব্ আহত হইলেন।

সোরাব্ তখনও নির্ভীক্। অতিক্ষীণস্বরে রোস্তমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"শীঘ্র ইহার প্রতিফল পাইবে। রোস্তম্ যখন তাঁহার পুত্রের মৃত্যুকথা শুনিবেন, তখন তাঁহারই হস্তে উপযুক্ত শাস্তি পাইবে।"

নিজেরই সন্তান যে পদতলে পড়িয়া রহিয়াছে, রোস্তম্ তাহা জানিতে পারিলেন না। সোরাবের কথায় বিশ্বাস না করিয়া তিনি বলিলেন,—"নির্ব্বোধ, কেন বৃথা প্রলাপ বকিতেছ ? রোস্তমের পুত্র হয় নাই, একটিমাত্র কন্যা আছে।"

সোরাব্ আবার ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—"আমি মিথ্যা বলি নাই। রোস্তমের পুত্র আছে এবং সেই পুত্রই আমি। বিংশতি বর্ষের মধ্যে একদিনের জন্যও আমি পিতার মুখ দেখি নাই। মাতাকে পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নীরব হইয়া থাকিতেন। শেষে আর না থাকিতে পারিয়া আমি পিতার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, তাতারবাসীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পারসিক বীরদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলে, পিতা রোস্তম্ নিশ্চিতই যুদ্ধে উপস্থিত হইবেন এবং তখন পিতৃচরণ দর্শন করিব। আমার আশা পূর্ণ হইল না। মনে করিয়া দেখ, যখন রোস্তম্ তাঁহার একমাত্র পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিবেন, তখন তাঁহার হৃদয় কিপ্রকার আহত হইবে। পিতার কথা ভাবি না। মাতা আমাকে হারাইয়া কি জীবিত থাকিবেন ?" এই বলিয়া সোরাব্ বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

রোস্তমের এখনও বিশ্বাস হইল না যে, সোরাব্ই তাঁহার পুত্র। পুত্র হইয়াছে শুনিলে, রোস্তম্ শৈশবে তাহাকে কাড়িয়া লইবেন, এই আশঙ্কায় তাহ্মিনা তাঁহার কন্যা হইয়াছে, এই

মিথ্যা সংবাদ প্রবাসী স্বামীকে জানাইয়াছিলেন। সেই-অবধি রোস্তমের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পুত্র হয় নাই, কন্যা হইয়াছে।

রোস্তমের অবিশ্বাস দেখিয়া সোরাব্ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"আমি যে সত্যই মহাবীর রোস্তমের পুত্র, তুমি যদি তাহার প্রমাণ দেখিতে চাও, তবে আমার দক্ষিণ বাহুর কবচখানির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখ, ইহাতে আমার পিতা রোস্তমের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। পিতার আদেশ ছিল, তাঁহার পুত্র জন্মিলে এই কবচ পুত্রের বাহুতে বাঁধিয়া দেওয়া হইবে।"

কবচ দেখিয়া রোস্তমের সর্ব্বদেহ কম্পিত হইতে লাগিল এবং দুই চক্ষু হইতে অবিরলধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি ভূশায়ী আহত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন,—"বৎস, তুমি মিথ্যা বল নাই! আমিই তোমার হতভাগ্য পিতা রোস্তম্! যে পিতার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তুমি গৃহ-ত্যাগ করিয়াছ, সেই পিতারই হস্তে তোমার মৃত্যু হইল!"

সোরাবের পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে ক্ষণিক রক্তরাগ প্রকাশিত হইল এবং দুর্ব্বল বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া তিনি পিতাকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু ইহাই পিতাপুত্রের শেষ আলিঙ্গন হইল; সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃভক্ত সোরাব্ পিতার স্নেহক্রোড়ে শয়ন করিয়া চিরনিদ্রিত হইলেন। ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া নিবিড়তর হইয়া আসিল এবং অদূরবর্ত্তী শিবিরে একে

একে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল; বৃদ্ধ রোস্তম্ তখনও পুত্রের মৃতদেহ অঙ্কে স্থাপন করিয়া নদীসৈকতে উপবিষ্ট রহিলেন।

প্রশ্নাবলী।

১। রোস্তম্ কেন সোরাব্‌কে নিজের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই?

২। অদূরবর্ত্তী, উর্ব্বর, দীর্ঘ,—এই কয়েকটি পদের বিপরীতার্থ-বোধক শব্দ বল।

৩। মহাবীর, শ্রেণীবদ্ধ,—এই কয়েকটি পদ কোন্ কোন্ সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে? প্রত্যেকের ব্যাস-বাক্য বল।

৪। এই পাঠ হইতে তোমরা কি শিক্ষা করিলে?

৫। সৈকত, উপবিষ্ট, গর্ব্বিত,—এই কয়েকটি শব্দ কিপ্রকারে নিষ্পন্ন হইল?

জেনেরল্ বুথ্।

পুরাণ এবং ইতিহাসের ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোন রাজা কেবল বাহুবলে নিজ প্রভুত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইংরাজ-রাজের যে বিপুল প্রতাপ সমগ্র ভূমণ্ডলে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, তাহাও বাহুবল হইতে উৎপন্ন নয়; বহু ঈশ্বরপরায়ণ এবং মানবহিতাকাঙ্ক্ষী

মহাত্মার জীবনব্যাপী সাধনার ফলেই ইংরাজজাতি জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। যাঁহাদের নিঃস্বার্থ প্রেম, অকৃত্রিম স্বধর্ম্মনিষ্ঠায় এই জাতি গৌরবান্বিত, মহাত্মা বুথ্ তাঁহাদেরই অন্যতম। তিনি এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ গত পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপিয়া বিপথগামী মানবগণকে পুণ্য এবং সত্যের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে প্রকার আন্তরিক চেষ্টা বর্ত্তমান কালে অল্প লোকেই করিয়াছেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নটিংহাম্ নগরে বুথ্ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পাপীকে পাপপথ হইতে এবং দরিদ্রকে দারিদ্র্যের কঠোরতা হইতে মুক্ত করাই মানবের পরম ধর্ম্ম।

সপ্তদশ বৎসর বয়সে বুথ্ ধর্ম্মপ্রচারকপদে নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে শ্রমসাধ্য ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু বুথ্ চিকিৎসকের পরামর্শে কর্ণপাত করেন নাই, নটিংহ্যাম্ হইতে লণ্ডন সহরে আসিয়া সহস্র সহস্র পাপী তাপীর মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যখন কেহ সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তখন বিপুল ঐশ্বরিক শক্তি তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তির সহিত মিলিত হইয়া অসাধ্য সাধন করিতে থাকে। বুথের সৎকার্য্যস্পৃহা দেখিয়া

সহস্র সহস্র লোক ব্যাকুল হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। বুথ্ অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন এবং তাঁহার স্বভাবসুন্দর সুখশ্রীতে সর্ব্বদাই দৃঢ়তা প্রকাশ পাইত; এই সকল কারণে লোকে সহজেই বুথের উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া পড়িত।

গত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বুথ্ সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র ছিল। অদ্যাপি সেই শিষ্যগণই ইয়ুরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে লোকহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়াতে প্রায় পঞ্চাশটি সেবাশ্রম বুথের শিষ্যগণের তত্ত্বাবধানে চালিত হইতেছে। কোনটিতে মাতাপিতৃহীন বালকবালিকাদিগকে শিক্ষাদান করা হইতেছে, কোনটিতে কারাগার হইতে সদ্যোমুক্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দেওয়া হইতেছে। অশিক্ষিত শ্রমজীবিগণ তাহাদের সামান্য উপার্জ্জন প্রায়ই মদ্যপানে ব্যয় করে। বুথের শিষ্যবর্গ যে কত মদ্যপায়ী শ্রমজীবীকে সৎপথে আনয়ন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতা এবং সিমলায় ইঁহাদের আশ্রম আছে; সেখানেও শত শত অনাথ বালকবালিকা আশ্রয় পাইয়া সুশিক্ষা লাভ করিতেছে।

বুথ্ সাহেব জনসাধারণের কত প্রিয় ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে লণ্ডনের অধিবাসিগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সমাধিস্থ করিবার পূর্ব্বে বুথের মৃতদেহ কয়েক

দিন লণ্ডনের কোন স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল। প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ নরনারী মৃতদেহ দেখিবার জন্য সমবেত হইত এবং দেহ প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিত। আমাদের সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ এবং রাজমাতা আলেক্‌জেণ্ড্রা পুষ্পমাল্য প্রেরণ করিয়া বুথ্ সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বুথ্ সাহেব প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি কোটি কোটি স্বুবর্ণ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া পৃথিবীর মধ্যে হত ত শ্রেষ্ঠ ধনী হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি স্বুবর্ণমুষ্টিকে ধূলিমুষ্টি জ্ঞান করিয়া পাপীর মুক্তিবিধান এবং দুঃখীর দুঃখ-বিমোচনকেই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এইজন্যই বুথ্ সাহেবের পুণ্যস্মৃতিতে আজও সহস্র সহস্র নরনারী অশ্রুপাত করে।

প্রশ্নাবলী।

১। বুথ্ সাহেবের জীবনের কি লক্ষ্য ছিল, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। বুথ্ সাহেবের শিষ্যবর্গ সাধারণতঃ কি কি কার্য্য করেন, বল।

৩। স্বুবর্ণমুষ্টি, প্রতিভাবান্, ইয়ত্তা, নিঃস্বার্থ,—এই কয়েকটি পদের অর্থ কি ?

৪। লোকহিতাকাঙ্ক্ষী, মহাত্মা, মদ্যপান, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা,—এই কয়েকটির সমাস কি বল এবং ব্যাস-বাক্য লিখ।

কৌশলে উপদেশ।

(স্থলতান মামুদ ও আকবরের জীবনের ঘটনা)

(১)

ভারতবর্ষে হিন্দু-নৃপতিবর্গের শক্তি খর্ব্ব হইলে, বিদেশাগত মুসলমান আক্রমণকারীদিগের অত্যাচারে ভারতবাসিগণকে দীর্ঘকাল ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তখনও ভারতের প্রধান নগরগুলি সমৃদ্ধিশালী ছিল; এই সকল স্থানের ধনরাশি লুণ্ঠন করিয়া আক্রমণকারিগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিত।

গজনীর স্থলতান মামুদ ধনরত্নের লোভে দ্বাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক বারে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার মণিমাণিক্য লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে শত শত নগর মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল এবং অশেষ কারুকার্য্যময় শত শত দেবমন্দির ইষ্টকস্তূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল। মানব যখন ধনলোভে চালিত হয়, তখন তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মভেদ ও সদসৎ জ্ঞান থাকে না। মামুদের ধনলিপ্সা এত প্রবল ছিল যে, সহস্র সহস্র নরনারীকে নিরাশ্রয় করিয়া তিনি অণুমাত্র ব্যথিত হইতেন না

এবং লুণ্ঠনকারী অনুচরবর্গের অত্যাচারে যখন গ্রামে ও নগরে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইত, তখন তাহাতেও তিনি বিচলিত হইতেন না।

ভৃত্যগণ প্রায়ই প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া থাকে। মামুদের অনুচরবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রভুর ন্যায় নিষ্ঠুর ছিল, কেবল তাঁহার মন্ত্রী হৃদয়বান্ ব্যক্তি ছিলেন। নির্ম্মম কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য মন্ত্রী মামুদকে বহু পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এদিকে মামুদের অত্যাচারে দেশ প্রতিদিনই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেশের এই দুর্দ্দশায় মন্ত্রী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে প্রকারে হউক, মামুদকে এই সকল কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতেই হইবে।

একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে মামুদ ও মন্ত্রী উভয়ে উদ্যানে বায়ুসেবন করিতেছিলেন; তখন নানাজাতীয় বিহঙ্গমের কাকলিতে উদ্যান মুখরিত। মামুদ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানবের বাগ্‌যন্ত্র আছে এবং মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষাও আছে; পক্ষীরা ভাষা দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না কি?" মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "পক্ষীরাও মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু সে ভাষায় জ্ঞান লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আমি বাল্যকালে এক ফকিরের অনুগ্রহে পক্ষীর

ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলাম; এখনও তাহা বিস্মৃত হই নাই।”

মন্ত্রীর কথায় মামুদের কৌতূহলবৃদ্ধি হইল। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট থাকিয়া দুইটি পেচক তখন বিকট-স্বরে চীৎকার করিতেছিল। পেচক দুইটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মামুদ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহারা পরস্পর কি বলিতেছে, বুঝিতে পারিতেছ কি?” চতুর মন্ত্রী ভাবিতে লাগিলেন, মামুদকে সৎপথে আনয়নের ইহাই উপযুক্ত অবসর। পক্ষিদ্বয়ের রব-শ্রবণের ভাণ করিয়া, তিনি কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন এবং পরে মামুদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “পেচকযুগল পরস্পর যে বিষয়টির আলোচনা করিতেছে, তাহার বৃত্তান্ত অবগত হইলে আপনার ক্রোধসঞ্চার হইতে পারে। অভয় প্রদান করুন, আমি উহাদের কথোপ-কথনের বিষয় বিবৃত করি।” মন্ত্রীর চতুরতায় মামুদের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছিল; অসঙ্কোচে সকল কথা ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন। মন্ত্রী যোড়করে নিবেদন করিলেন, “পেচকদ্বয় তাহাদের বিচরণ-ক্ষেত্র লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে। জনশূন্য নগর এবং ভগ্ন অট্টালিকাদিই পেচকদিগের বিচরণস্থান। পেচক-দ্বয়ের মধ্যে যেটি বলশালী, সে দুর্ব্বল পেচককে নিকটবর্ত্তী জনশূন্য গ্রামে ও নগরে পরিভ্রমণ করিতে নিষেধ করিতেছে, কিন্তু দুর্ব্বল পেচকটি ইহাতে একটুও ক্ষুণ্ণ হইতেছে না। সে

দ্বিগুণ চীৎকার করিয়া বলিতেছে, ‘যতদিন সুলতান মামুদ জীবিত আছেন, ততদিন প্রত্যহই নূতন জনশূন্য গ্রাম নগর আমার অধিকারে আসিবে।’ ”

মন্ত্রি-মুখে পেচকদ্বয়ের কথোপকথনের মর্ম্ম অবগত হইয়া মামুদ লজ্জায় এবং আত্মগ্লানিতে অধোবদন হইলেন। তিনি এপর্য্যন্ত যে সকল নৃশংস কার্য্য করিয়াছেন, একে একে তাহা স্মরণপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিতে লাগিল। কথিত আছে, এই ঘটনার পরে মামুদ আর কোন নিষ্ঠুর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব প্রজাহিতকার্য্যে ও আশ্রিতের রক্ষণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পাপের আপাতমধুর প্রলোভনে অন্ধ হইয়া যে ব্যক্তি বিপথগামী হয়, কৌশলে একবার সৎপথের সন্ধান দিতে পারিলে, তাহার চরিত্র আদর্শস্থানীয় হইয়া পড়ে।

(২)

পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান নরপতিদিগের সভায় এক একটি সুরসিক পারিষদ থাকিতেন। গুরু রাজকার্য্যের অবসানে যখন রাজা বিশ্রাম করিয়া ক্লান্তিদূর করিতেন, তখন রসিক পারিষদ রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইতেন এবং নানা হাস্যকর গল্পাদি বলিয়া প্রভুর চিত্তবিনোদন করিতেন।

মোগল বাদশাহ আকবরের সভায় বীরবল নামে ঐ শ্রেণীর একজন সভাসদ্ ছিলেন। অন্যায়াচরণ করিলে, কেহই তাঁহার শ্লেষাত্মক তীব্র ভৎ‍র্সনা হইতে মুক্তিলাভ

করিতে পারিত না। এইকারণে রাজপারিষদ-গণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার শত্রু হইয়া পড়িয়াছিলেন।

একদা কোন পারিষদ বীরবলের বিরুদ্ধে কতকগুলি তুচ্ছ অভিযোগ করায়, আকবর ক্রোধান্ধ হইয়া বীরবলকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। বীরবল অপরাধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সামান্য অপরাধে এইপ্রকার কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়া, তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অণুমাত্র ভীত হয়েন নাই; কারণ তিনি জানিতেন, ন্যায়পরায়ণ আকবর অপরাধের প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইলেই দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিবেন।

নির্ব্বাসনের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে একদা বীরবল আকবরের সমীপে উপস্থিত হইয়া যোড়করে নিবেদন করিলেন, "বাদশাহের নির্ব্বাসনদণ্ডাজ্ঞা পালন করিতে দাস প্রস্তুত আছে; কিন্তু নির্ব্বাসনে যাইবার পূর্ব্বে কিপ্রকারে মুক্তাবৃক্ষ পালন করিতে হয় এবং সেই বৃক্ষ হইতে কি-প্রকারে রাশি রাশি মুক্তাফল আহরণ করিতে হয়, সেই কৌশলটি আপনাকে শিক্ষা দিবার ইচ্ছা করি।"

মুক্তা বপন করিলে যে, বৃক্ষ জন্মে না এবং মুক্তার ফলও উৎপন্ন হয় না, আকবর তাহা জানিতেন। কি উদ্দেশ্যে বীরবল এইপ্রকার অদ্ভুত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তাহা জানিবার জন্য আকবর কৌতূহলী হইয়া পড়িলেন। তিনি বীরবলের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।

বীরবল পূর্ণমনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং একখণ্ড ভূমিতে কয়েক মুষ্টি গোধূমবীজ বপন করিয়া, তাহাতেই মুক্তাবৃক্ষ জন্মিবে বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন। যথাসময়ে কয়েকটি গোধূমের গাছ উৎপন্ন হইল এবং তাহাতে কয়েক গুচ্ছ গোধূমও জন্মিল। বীরবল এই সময়ে পুনরায় আকবরের সভায় উপস্থিত হইলেন এবং মুক্তাবৃক্ষ হইতে মুক্তাফল-সংগ্রহের জন্য বাদশাহকে সানুনয়ে আহ্বান করিলেন।

সভাসৎ-পরিবৃত হইয়া আকবর পর দিবস অতি-প্রত্যূষে বীরবলের ক্ষুদ্র গোধূমক্ষেত্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন শীতকাল। রাত্রির শিশির গোধূমমঞ্জরীতে সঞ্চিত হইয়া মুক্তাফলের ন্যায় দুলিতেছিল। বীরবল সেই শিশিরবিন্দুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "জাহাঁপনা, আমার কয়েকটি গাছে কত মুক্তা ফলিয়াছে দেখুন। কিন্তু এই মুক্তা সকলে সংগ্রহ করিতে পারিবে না। যিনি জীবনে কখনই অন্যায়াচরণ করেন নাই, কেবল তিনিই এই মুক্তার আহরণে অধিকারী। অন্যায়াচারীর সংস্পর্শে এই কমনীয় মুক্তাবলী জলে পরিণত হইয়া যাইবে।"

বীরবলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাসদ্‌গণ স্তব্ধ হইলেন এবং স্বয়ং আকবরও নির্ব্বাক্ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সকলেই নিজের অতীত জীবনের কথা আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে, নানা সময়ে তাঁহারা অন্যায় কার্য্য

করিয়াছেন! কি উদ্দেশ্যে বীরবল মুক্তাবৃক্ষের কথার অবতারণা করিয়াছিলেন, আকবর এখন তাহা বুঝিলেন। তিনি বীরবলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জগতে সকলেই ভ্রমে পড়িয়া কখন কখন অন্যায় আচরণ করে। তুমি যে অন্যায় করিয়াছিলে তাহার জন্য তুমি যখন অনুতপ্ত, তখন তোমার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। তোমার নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইল।"

প্রশ্নাবলী।

১। সুলতান মামুদ কোন্ দেশের লোক ছিলেন? ইতিহাসে তিনি কেন প্রসিদ্ধ?

২। কৌতূহলাক্রান্ত, অধোবদন, অনুতাপানল, বিপথগামী,—এই-গুলির ব্যাসবাক্যের সহিত সমাস বল।

৩। মুক্তার বৃক্ষ হয় এবং সেই বৃক্ষে মুক্তাফল জন্মে, ইহা কি আকবর বিশ্বাস করিয়াছিলেন?

৪। বীরবল কাল্পনিক মুক্তা-ফল দেখাইয়া আকবরকে কি শিক্ষা দিয়াছিলেন?

৫। বিমোচন, মধুর, ত্রস্ত, মুখরিত,—এই গুলির অর্থ বল।

আব্দুল গণি সাহেব বাহাদুর।

যে মহাত্মার দানশীলতায় বঙ্গবাসী বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী নানাপ্রকারে উপকৃত, যাঁহার মৃত্যুসংবাদশ্রবণে ধনী নির্ধন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বিলাপধ্বনিতে গগনমণ্ডল নিনাদিত করিয়াছিলেন, শত শত ব্যক্তি জাতিনির্ব্বিশেষে যে পুণ্যশীলের মৃত দেহের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ সমবেত হইয়াছিল, এই পাঠে সেই সহৃদয় নবাব আব্দুল গণির জীবনকথা বিবৃত করিব।

দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ও দারিদ্র্যের পীড়নে নিষ্পিষ্ট হইয়া, যাঁহারা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়বলে সৌভাগ্য-সোপানে আরোহণ করেন, তাঁহারা যে দরিদ্রের দুঃখনিবারণে তৎপর হইবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এরূপ না হওয়াই বিচিত্র। কিন্তু যাঁহারা ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, সুখশান্তি বিলাসের শীতল ছায়ায় বর্দ্ধিত হইয়াছেন, কখনও দারিদ্র্যের জ্বালায় দগ্ধ হয়েন নাই, তাঁহারা যদি দারিদ্র্যপীড়িতের মর্ম্ম-বেদনা অনুভব করেন এবং তাহার প্রতিকারের জন্য স্বীয় ধন ও জীবন উৎসর্গ করেন, তাহা বিস্ময়ের ও প্রশংসার বিষয়ই বটে। বর্ণনীয় মহাত্মা আজন্ম সুখে বর্দ্ধিত ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও কিপ্রকারে দরিদ্রের দুঃখদূরীকরণে এবং

বিপন্নের বিপন্নিবারণে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে কাহার না কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়?

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ৩০এ জুলাই ঢাকা নগরীতে খাজা আব্দুল গণি সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা খাজা আলিমুল্লা সাহেব ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বিষয়-বিভব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায়, আজপর্য্যন্ত এই পরিবার ঢাকার প্রধান ধনী বলিয়া খ্যাত।

ধনীর গৃহে শিশুর যেরূপ লালনপালন হওয়া উচিত, আব্দুল গণির তদ্রূপই হইতে লাগিল। উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে তাঁহার শিক্ষাভার অর্পিত হওয়ায়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দ্দূ, পারসী ও ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াই পিতা নিশ্চিন্ত হইলেন না। পুত্র যাহাতে যৌবনপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই বিষয়কার্য্যে জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারেন, তাহারও বিধান করিলেন। খাজা আলিমুল্লা সাহেবের সুব্যবস্থায় আব্দুল গণি সাহেব অল্পকালমধ্যে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিলেন। পুত্রের যোগ্যতাদর্শনে খাজা সাহেব তাঁহাকে বিষয়কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত করেন এবং তিনিও স্বীয় প্রখর বুদ্ধি ও চরিত্রবলে পিতৃপ্রদত্ত সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

খাজা আব্দুল গণি সাহেব পৃথিবীর নানাস্থানে মসজিদ-

নির্ম্মাণ, হিন্দুর দেবালয়সংস্কার, অতিথিশালা, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়ের সংস্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর ব্যাপারে অকাতরে অর্থদান ত করিয়াছিলেনই, ইহা ব্যতীত তাঁহার দৈনিক ও মাসিক নির্দ্দিষ্ট দানও ছিল। এই সকল দানের কথা বিবৃত করিতে হইলে, প্রবন্ধ অতিদীর্ঘ হইয়া পড়িবে। কাজেই খাজা সাহেব ঢাকা নগরীতে যে সকল দানশীলতার কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহারই দুই একটির উল্লেখমাত্র করিতেছি। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, খাজা আব্‌দুল গণি সাহেব কিরূপ দয়াবান্, দানশীল, মহামনাঃ, নিরহঙ্কার ও পরদুঃখকাতর ছিলেন।

খাজা সাহেব প্রতিদিন প্রত্যূষে অশ্ব বা শকটারোহণে প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। ভ্রমণকালে পথের ভিখারী-দিগকে টাকা, আধুলি, সিকি দুয়ানি প্রভৃতি দান করিতে করিতে চলিয়া যাইতেন। এক দিবস তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৃহপ্রবেশকালে, দ্বারদেশে এক আতুরা ভিখারিণীকে ভিক্ষার্থে দণ্ডায়মানা দেখিতে পাইয়া, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দুইটি টাকা ফেলিয়া দিলেন। একটি টাকা নিকটস্থ দূর্ব্বাদলের নিম্নে অদৃশ্য হওয়ায়, ভিখারিণী তাহা উদ্বিগ্নচিত্তে অন্বেষণ করিতে লাগিল। আতুরা রমণীর কষ্ট দেখিয়া, খাজা সাহেব তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং টাকাটি দূর্ব্বাদলের মধ্য হইতে বাহির করিয়া রমণীর হস্তে দিলেন। ভিখারিণী টাকা প্রাপ্ত হইয়া এবং খাজা

সাহেবের সৌজন্য দেখিয়া, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ অশ্রুবর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

খাজা সাহেবের জীবিতকালে এক রজনীতে ঘূর্ণিবায়ু উত্থিত হইয়া, ঢাকা নগরী বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এমন কি, তাঁহার সুদৃঢ় প্রাসাদও সেই বিষম বাতাবর্ত্ত হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হয় নাই। এই বিপৎপাতে শত শত অধিবাসী গৃহহীন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র, এইরূপ নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় শত শত ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় দুঃখকাহিনী জানাইবার জন্য খাজা সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইল। তিনি স্বীয় চূর্ণীভূত প্রাসাদের ভগ্নস্তূপের উপরে দণ্ডায়মান ছিলেন। সমাগত নিঃস্ব জনগণের দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করিবামাত্র, খাজা সাহেব তাহাদিগের সাহায্যার্থ দশ সহস্র মুদ্রা দান করিলেন।

ঢাকায় পরিষ্কৃত কলের জল প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, সহস্র সহস্র অধিবাসী কূপ ও পুষ্করিণীর অপরিষ্কৃত জল ব্যবহার করিয়া, প্রতিবৎসর ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক রোগে প্রাণ হারাইত। পরদুঃখে কাতর খাজা সাহেবের হৃদয় লোকের এইরূপ দুঃখ দেখিয়া বিগলিত হইয়াছিল। তিনি ঢাকাবাসীদিগকে মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া ঢাকায় জলের কল স্থাপন করেন এবং যাহাতে জনসাধারণ বিনাব্যয়ে ইচ্ছানুরূপ জল ব্যবহার করিতে পারে, তাহারও সুব্যবস্থা করেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৪এ আগষ্ট খাজা সাহেব মানব-লীলা সংবরণ করেন। তাঁহার দানশীলতার জন্য কেবল দানভোগী ও দানগ্রাহী ব্যক্তিগণ কৃতজ্ঞ ছিলেন এমন নহে, সরকার বাহাদুরও বহুসম্মানসূচক 'সার,' 'কে সি এস্ আই' ও 'নবাব বাহাদুর' উপাধি দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করেন এবং শেষোক্ত উপাধি তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে ভোগ করিবেন, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন।

নবাব সার আব্দুল গণি কে সি এস্ আই, সাহেব বাহাদুরের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র নবাব সার আসানুল্লা, কে সি এস্ আই, সাহেব বাহাদুরও পিতার ন্যায় প্রচুর দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

প্রশ্নাবলী।

১। নবাব আব্দুল গণির জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে কি বুঝিলে সংক্ষেপে বল।

২। "অনুক্রম" এই পদটির অর্থ কি? "ক্রম" এই শব্দটির পূর্ব্বে অপর উপসর্গ যোগ করিয়া কয়েকটি নূতন শব্দের গঠন কর এবং সেগুলির অর্থ বল।

৩। অপরিষ্কৃত, প্রচুর, অধিকারী,—এই কয়েকটি পদের বিপরীতার্থবোধক পদ কি?

৪। সুখশান্তিবিলাস, দারিদ্র্যপীড়িত,—এই দুইটি পদের সমাসবাক্য বল।

ভারতের ডাক-বিভাগ।

দস্যুতস্কর-প্রভৃতির দৌরাত্ম্য হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের পরম দয়ালু সম্রাট্ ভারতবর্ষে অতি-সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতিগ্রামে ও নগরে বহু শান্তি-রক্ষক দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখেন; অপরাধ করিলেই তাহারা ধৃত হয় এবং বিচারক তাহাদিগকে দণ্ডিত করেন। শান্তিরক্ষার এইপ্রকার সুব্যবস্থায় আমাদের গার্হস্থ্যজীবন সুখময় হইয়াছে। পূর্ব্বে রাজপথগুলির অবস্থা ভাল ছিল না। যাঁহারা পদব্রজে বা অশ্বারোহণে চলিতে পারিতেন না, তাঁহাদিগকে মন্থরগামী গো-যানে আরোহণ করিয়া সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইত; এতদ্ব্যতীত পথে দস্যু-তস্করের উপদ্রবও ছিল। রাজানুগ্রহে এখন সেই সকল অসুবিধা অনেকপরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে। অধুনা প্রায় তেত্রিশ হাজার মাইল দীর্ঘ রেলপথ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্য আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ যাত্রী বাষ্পীয়-যানে সেই সকল পথে বহুদূরে গমন করিতেছে এবং বণিগ্‌গণ সেই পথে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বহুমূল্য পণ্য দ্রব্য আনয়ন ও প্রেরণ করিয়া পরস্পরের অভাব মোচন করিতেছেন।

প্রজার হিতকল্পে ভারতেশ্বর আমাদের দেশে যে সকল শুভানুষ্ঠান করিতেছেন, আমরা কেবল তাহার দুইটিমাত্র উল্লেখ করিলাম। নিঃশেষে সকলগুলির আলোচনা করিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। ভারতীয় প্রজাবৃন্দের পত্রাদি-আদানপ্রদানের জন্য রাজা যে ডাক-বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই পাঠে আমরা কেবল তাহারই আলোচনা করিব।

মুসলমান-নৃপতিগণের রাজত্বকালে পত্র-আদানপ্রদানের ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু অশীতি বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে স্থানান্তরে পত্রপ্রেরণের অণুমাত্র সুবিধা ছিল না। তখন পত্রপ্রেরক লোক নিযুক্ত করিতেন, এই লোকই যথাস্থানে পত্র বহন করিয়া লইয়া যাইত ও তাহার উত্তর আনয়ন করিত। ইহাতে দিল্লী আগ্রা বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি দূরবর্ত্তী নগরের অধিবাসীদিগের সহিত পত্রব্যবহার একপ্রকার অসম্ভবই ছিল। কলিকাতা হইতে ঢাকায়, বা ঢাকা হইতে চট্টগ্রামে, পত্রপ্রেরণের ব্যয়ভার তখন ধনশালী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ বহন করিতে পারিতেন না।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ভারতবাসীদিগের একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনই ভারতে ডাক-বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এখন যেমন জনসাধারণের পত্রাদি বহন করিয়া শত শত পদাতিক এবং রেলগাড়ী দিবা রাত্রি দৌড়া-দৌড়ি করে, তখন তাহা করিত না। নবপ্রতিষ্ঠিত ডাক-বিভাগে

কয়েকজনমাত্র রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন এবং তাঁহারাই রাজকার্য্যের জন্য পত্রাদিপ্রেরণের ব্যবস্থা করিতেন; জন-সাধারণের পত্রাদি সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রেরিত হইত। তখন ডাকঘর ছিল না এবং টিকিটও বিক্রীত হইত না। এক্ষণে এক পয়সা ব্যয়ে যেমন এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের অতিদূরবর্ত্তী স্থানেও পত্র প্রেরিত হইতেছে, এত স্বল্পব্যয়ে তখন কেহ পত্র প্রেরণ করিতে পারিত না, দূরত্বানুসারে পত্রের মাশুল অগ্রিম জমা দিতে হইত। এই হিসাবে কলিকাতা হইতে আগ্রায় পত্রপ্রেরণে বার আনা ব্যয় হইত।

আমরা আজকাল গ্রামে গ্রামে যে সকল ডাকঘর দেখিতেছি, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সেগুলির প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। ডাক্-টিকিটবিক্রয় এবং মনিঅর্ডারে প্রজাদিগের টাকা-প্রেরণের ভার এই সময় হইতেই ডাক-বিভাগ গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন এখনকার মত এক পয়সার পোষ্টকার্ডে পত্র লেখা হইত না এবং দুই পয়সার টিকিটে এক তোলা ওজনের পত্র প্রেরণ করাও যাইত না; সিকি তোলা ওজনের পত্র পাঠাইতে তখন দুই পয়সার টিকিটের প্রয়োজন হইত। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পোষ্টকার্ডের প্রথম ব্যবহার আরম্ভ হয়।

ডাকঘরের "সেভিংস্ ব্যাঙ্কের" নাম বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। "সেভিংস্ ব্যাঙ্কে" জনসাধারণ টাকা গচ্ছিত

রাখিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে ইচ্ছানুসারে সুদ সহ তাহা গ্রহণ করিতে পারে। ডাকঘরে টাকা গচ্ছিত রাখার এই ব্যবস্থায় দরিদ্র প্রজাবৃন্দের যে কত সুবিধা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। যাহাদের উপার্জ্জন অল্প, তাহারা ভবিষ্যতের জন্য অর্থসঞ্চয় করিতে পারে না; মিতব্যয়ী গৃহস্থ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিলে তাহা প্রায়ই আকস্মিক প্রয়োজনে ব্যয়িত হইয়া যায়। কিন্তু সেভিংস্ ব্যাঙ্কে প্রতিমাসে দুই এক টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিলে, দরিদ্র গৃহস্থের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা সুখের হইয়া পড়ে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ডাকঘরে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী স্থানে বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে হইলে, তাহা লোকের হস্তে প্রেরণ করা ব্যতীত অপর উপায় ছিল না; কিন্তু এখন সেই সকল সামগ্রী ডাকেই প্রেরণ করা যাইতেছে। সহস্র সহস্র সামগ্রী এইপ্রকারে প্রেরণ করিয়া এখন জনসাধারণ নিশ্চিন্ত থাকিতেছে; পথিমধ্যে তাহা প্রায়ই নষ্ট হয় না। স্বল্প মূল্যের দ্রব্যাদি ডাকে পাঠাইতে যে ব্যয় হয়, মূল্যবান্ সামগ্রী পাঠাইতে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাশুল দিতে হয় বটে, কিন্তু ইহাতে ভারতবাসিগণ যে উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা অতুলনীয়।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে, আমাদের নগরে বা গ্রামে যে ডাকঘর আছে, তাহার কার্য্য অল্প নয়। প্রতিদিন যে সহস্র সহস্র লোক মনি-অর্ডার করে

বা টাকা গচ্ছিত রাখে, তাহার সূক্ষ্ম হিসাব ডাকঘরকেই রাখিতে হয়। প্রত্যেক পত্রের ঠিকানা পাঠ করিয়া পত্রখানি যাহাতে অবিলম্বে যথাস্থানে প্রেরিত হয়, ডাকঘরের কর্ম্মচারী-দিগকে তাহারও উপায়বিধান করিতে হয়। এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যে ইংরাজি বাঙ্গালা দেবনাগরী উর্দ্দূ প্রভৃতি প্রায় ত্রিংশৎপ্রকার পৃথক্ লিপি প্রচলিত আছে; লোকে এই ত্রিংশৎপ্রকার ভাষায় পত্রাদি লিখিয়া থাকে। এই সকল বিচিত্র ভাষায় লেখা শিরোনামা পাঠ করিয়া ডাক-কর্ম্মচারিগণ যথাস্থানে পত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন। শিরোনামা-লেখার দোষে অভীপ্সিত ব্যক্তির নিকটে পত্রপ্রেরণ অসম্ভব হইলে, ডাক-কর্ম্মচারিগণ পত্র নষ্ট করেন না; বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যাহাতে সেগুলি যথাস্থানে প্রেরিত হয়, তাহার বিধান করেন। যে সকল ডাকঘরে এই কার্য্য চলে, তাহাকে "ডেড্ লেটার্ অফিস্" বলে। কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি বৃহৎ নগরে এই "অফিস্" আছে। সহস্র সহস্র কর্ম্মচারী এই সকল "অফিসে" কার্য্য করেন এবং প্রতিবৎসরে প্রায় পঞ্চাশৎ লক্ষ বিকৃতশিরোনামা যুক্ত পত্র যথাস্থানে প্রেরণ করেন। শিরোনামা-লিখিত ব্যক্তির সন্ধান একান্ত অসম্ভব হইলে, "ডেড্ লেটার্ অফিসের" কর্ম্মচারিগণ পত্র-গুলি লেখকদিগের নিকট প্রেরণ করেন।

অল্পব্যয়ে দূরদেশে পত্রাদি-প্রেরণের এই সকল সুযোগ থাকায়, এখন ভারতের দীনতম প্রজা হইতে আরম্ভ করিয়া

কোটিপতিপর্য্যন্ত সকলেই ডাকে পত্রাদির আদানপ্রদান করিতেছেন। ইহাতে ডাকবিভাগ এত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে যে, তোমরা তাহা শ্রবণ করিলে অবাক্ হইয়া যাইবে। সমগ্র ভারতবর্ষে এখন প্রায় ঊনবিংশতি সহস্র ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সেই সকল ডাকঘরে নানা সূত্রে প্রায় এক কোটি ব্যক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে। চিন্তা করিয়া দেখ, ভারতীয় প্রজাবৃন্দের মধ্যে কত লোক এই বিভাগে কার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

ভারতের সমগ্র ডাকঘরে প্রতিবৎসরে যে সকল পত্র দেওয়া হয়, তাহার সংখ্যার কথা শুনিলে তোমরা আরও বিস্মিত হইবে। বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ডাকঘরগুলির সাহায্যে এক শত তিন কোটি সত্তর লক্ষ পোষ্টকার্ড, খামের পত্র ও সংবাদ-পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। জনসাধারণ যে "পার্সেল" ডাকে প্রেরণ করে, তাহারও সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, উক্ত বৎসরে প্রায় এক কোটি পঞ্চবিংশতি লক্ষ "পার্সেল" ডাকঘরগুলিতে জমা হইয়াছিল। প্রতিবৎসরে মনি-অর্ডারে যে টাকা ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হয়, তাহার পরিমাণও অতীব বিস্ময়কর। উক্ত বৎসরে এই টাকার সমবেত পরিমাণ প্রায় ছাপ্পান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় ষোল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তি ডাকঘরের "সেভিংস্ ব্যাঙ্কে" মোট চব্বিশ কোটি টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। চিন্তা

করিয়া দেখ, এই কোটি কোটি টাকার হিসাব রক্ষা করা কত কঠিন কার্য্য। কিন্তু ডাকঘরের ব্যবস্থা এমন সুন্দর যে, হিসাবে কখনই একটি টাকারও ভ্রান্তি হয় না এবং সকলেই তাহাদের প্রাপ্য টাকা যথাসময়ে হস্তগত করিতে পারেন।

আমরা এই পাঠে ভারতের কেবল ডাক-বিভাগের স্থূল পরিচয় প্রদান করিলাম; আমাদের দেশের রাজকীয় সকল অনুষ্ঠানই এইপ্রকার সুশৃঙ্খলতায় চালিত হইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের অশেষ কল্যাণ বিধান করিতেছে।

প্রশ্নাবলী।

১। ভারতে ডাকবিভাগের প্রতিষ্ঠা কোন্ সময়ে হয়? কোন্ সময় হইতে ইহার উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়?

২। "সেভিংস্ ব্যাঙ্ক" কি প্রকারে জনসাধারণের উপকার করিতেছে?

৩। ইংরাজ-শাসনে ডাক-বিভাগে যেমন সাধারণের উপকার হইতেছে, সেইপ্রকার অপর দুইটি জনহিতকর অনুষ্ঠানের পরিচয় দাও।

৪। ডাকে টাকা পাঠাইবার সুবিধা কি? পূর্ব্বে লোক কি-প্রকারে টাকা ও পত্রাদি দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরণ করিত?

আকবর।

যে সকল মুসলমান নৃপতি নানা সময়ে ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মোগলসম্রাট্ আকবর নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। দয়া ক্ষমা উদারতা ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি সকল রাজধর্ম্মই তাঁহার চরিত্রে দৃষ্ট হইত। যুদ্ধ তাঁহার প্রিয় ছিল না; শত্রুকে বশীভূত করিতে হইলে, তিনি প্রথমে তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। অনেক সময়ে এই ব্যবহার গুণেই তাঁহার অনেক শত্রু মিত্রে পরিণত হইত।

আকবর।

ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আকবর সিংহাসনারূঢ় হয়েন। এই সময়ে বৈরাম খাঁ নামে একজন সেনাপতি আকবরের অভিভাবক ছিলেন। তিনি অতিনৃশংস প্রকৃতির লোক ছিলেন। একদা বৈরাম নৌকারোহণে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন,

হঠাৎ একটি পালিত হস্তী আসিয়া তাঁহার নৌকা আক্রমণ করিল। পালক সুকৌশলে হস্তী ফিরাইয়া লইয়া নৌকা রক্ষা করিল এবং বৈরামের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল; বৈরাম হস্তি-চালকের কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য আকবরকে অনুরোধ করিলেন এবং বিচারপূর্ব্বক অপরাধীকে দণ্ডিত করিবেন বলিয়া আকবরও প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু বৈরাম বিচার-কালপর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলেন না; যে হস্তি-চালক তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তিনি নির্ম্মমভাবে তাহারই প্রাণসংহার করিলেন। এই নিষ্ঠুর ঘটনার কথা আকবরের কর্ণগোচর হইল। এই অবস্থায় অপর কোন রাজা বৈরাম খাঁকে কখনই ক্ষমা করিতেন না; কিন্তু সদাশয় আকবর বৃদ্ধ সেনাপতির অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে মক্কায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আকবর মনে করিয়া-ছিলেন, ইহাতে বৈরামের চরিত্র সংশোধিত হইয়া যাইবে। এইপ্রকার ক্ষমার দৃষ্টান্ত মুসলমান-ইতিহাসে দুর্লভ।

আকবরের চরিত্রের আর একটি অনন্যসাধারণ গুণের উল্লেখ করিব। আকবর অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার মাতা নরযানারোহণে লাহোর হইতে আগ্রায় গমন করিতেছিলেন, তখন অপর বাহকদের সহিত স্বয়ং আকবর মাতার যান স্কন্ধে করিয়া নদী পার হইয়াছিলেন। এপ্রকার মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত সে সময়ে প্রকৃতই অত্যন্ত বিরল ছিল।

মাতার আদেশ আকবর কখনই অমান্য করেন নাই। কিন্তু এক সময়ে তিনি মাতার একটি অন্যায় আদেশ পালন করিতে পারেন নাই। একদা রাজধানীতে সংবাদ আসিল যে, কতকগুলি অশিক্ষিত পর্টুগীজ্ নাবিক একখানি জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া তাহাতে যে মুসলমানধর্ম্ম-গ্রন্থ পাইয়াছিল, সেখানি দগ্ধ করিয়া মুসলমানসম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছে। এই সংবাদে ক্রুদ্ধা হইয়া মাতা আকবরকে আদেশ করিলেন যে, পর্টুগীজ্‌দের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ ঐপ্রকারে দগ্ধ করা হউক। আকবর আদেশ প্রতিপালন না করিয়া মাতাকে বলিয়াছিলেন, যে কার্য্য অশিক্ষিত নাবিকদের পক্ষে নিন্দনীয়, তাহা একজন সম্রাটের পক্ষে আরও নিন্দনীয়। কোন ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলে, ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়; অতএব মাতার আদেশ প্রতিপালন করা সম্ভব নয়। দেখ, আকবর কিপ্রকার ন্যায়পরায়ণ এবং উদার ছিলেন।

প্রশ্নাবলী।

১। আকবরের চরিত্রে যে সকল বিশেষ গুণ দৃষ্ট হইত, তাহার উল্লেখ কর।

২। উদার, শিক্ষিত, ক্রুদ্ধ, ধর্ম্ম, নিন্দা,—এই শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষণ আছে, তাহাদিগকে বিশেষ্যে এবং বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে রূপান্তরিত কর।

৩। "কোন ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলে, ঈশ্বরের প্রতি

ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়”—কার্য্য দ্বারা আকবর কিপ্রকারে এই উক্তিকে সার্থক করিয়াছিলেন ?

৪। আকবর কিপ্রকারে শত্রুজয়ের চেষ্টা করিতেন ?

কৃতজ্ঞতা।

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আনন্দমোহন বসুর জীবনের দুইটি ঘটনা)

অনাহারক্লিষ্ট ভিক্ষুককে দেখিয়া যে ব্যক্তি গৃহদ্বার রুদ্ধ করে, সে সমাজে নিন্দনীয় এবং জগদীশ্বরের নিকটে অপরাধী হয়। এইপ্রকার ব্যক্তি সমাজের কলঙ্ক। পক্ষান্তরে কোন নিরন্ন ও নিরাশ্রয় ভিক্ষুক যদি কোন দয়াবান্ ব্যক্তির প্রসাদে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া সেই দয়ার কথা বিস্মৃত হয়, তবে তাহারও অপরাধের সীমা থাকে না ; সে মনুষ্যনামের অযোগ্য। দাতা হাস্যমুখে সাদরে দান করেন এবং গ্রহীতা সেই দান গ্রহণ করিয়া চিরকৃতজ্ঞ থাকেন, এই মধুর সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সংসার এত সুখময় হইয়াছে। মাতাপিতা সন্তানের জন্য যাবজ্জীবন যে নিঃস্বার্থ স্নেহ প্রদর্শন করেন তাহা যদি সন্তান বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে আমাদের গৃহ কি প্রকার অশান্তিপূর্ণ হইয়া পড়ে, একবার চিন্তা করিয়া দেখ। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজার

আহার-সংস্থানের জন্য রাজা অজস্র অর্থব্যয় করেন, রুগ্ণের সেবার জন্য শত শত দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং জ্ঞান ও বিদ্যার উন্নতির জন্য সহস্র সহস্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কোন অকৃতজ্ঞ প্রজা যদি রাজার এই সকল দানের কথা বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের ও সমাজের অবস্থা কিপ্রকার হইয়া পড়ে, তাহাও একবার চিন্তা কর। তখন ঘরে বাহিরে সুখ থাকে না, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণাই সুখের উপরে আধিপত্য বিস্তার করে।

উপকারীর প্রত্যুপকার করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু উপকারের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকা সকলের পক্ষেই অনায়াস-সাধ্য। যিনি উপকার করেন, তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলে যে, কত আনন্দ পাওয়া যায়, নিম্নের দুইটি ঘটনায় তোমরা তাহার পরিচয় পাইবে।

(১)

গত ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়ে আমাদের পরম-শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্দ্ধমান ষ্টেশনে একটি শীর্ণকায় ভিক্ষুক বালককে দেখিয়াছিলেন। বালক দুই দিন অনাহারে ছিল। দুঃখী ব্যক্তিকে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতেন না; তিনি বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাকে যদি চারিটি পয়সা দিই, তবে তুমি তাহা লইয়া কি কর?" বালক উত্তর করিল, "দুই পয়সার জলখাবার ক্রয় করিয়া ভক্ষণ

করি এবং অবশিষ্ট দুইটি পয়সা আমার মাতাপিতার হস্তে দিই। তাঁহাদের আজ দুই দিন আহার হয় নাই।” বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার প্রশ্ন করিলেন, “তোমাকে যদি চারি আনার পয়সা দিই, তবে তাহা লইয়া কি কর?” বালকের দুই গণ্ড অশ্রুপ্লাবিত হইল; সে গদ্‌গদ্‌-স্বরে বলিল, “তাহা হইলে দুই আনার চাউল ক্রয় করিয়া মাতার নিকটে দিয়া আসি এবং অবশিষ্ট দুই আনার আম্র ক্রয় করিয়া তাহা বিক্রয় করি ও তাহাতে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করি।” বিদ্যাসাগর মহাশয় আর কোন প্রশ্ন না করিয়া বালকের হস্তে একটি টাকা দিলেন। সে অসম্ভাবিত ভিক্ষা-লাভে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না; বারংবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল।

এই ঘটনার পরে ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছিল; তখন আর দেশে দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্ট ছিল না, প্রায় সকলেরই অবস্থা ভাল। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে আবার বর্দ্ধমান যাইতে হইয়াছিল। কার্য্য শেষ হইয়া গেল; বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বাজারের ভিতর দিয়া রেল্‌-ষ্টেশনের দিকে আসিতেছিলেন। এক অপরিচিত বলিষ্ঠ যুবক পথিপার্শ্বস্থ একটি বৃহৎ দোকান হইতে হঠাৎ বহির্গত হইল এবং পদধূলিগ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অপরিচিত যুবকটির এই ব্যবহারে বিস্মিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

হইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" যুবক সাশ্রুনয়নে উত্তর করিল, "দুর্ভিক্ষের সময়ে যাহাকে আপনি দয়া করিয়া একটি টাকা ভিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি সেই ভিক্ষুক। আপনার সেই টাকাটিই আমার ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়াছে। আট আনার পয়সা লইয়া আম্রের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলাম; সেই ব্যবসায়-সূত্রে এখন আমি গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতেছি।" বিদ্যাসাগর মহাশয় যুবকের এই পরিচয়ে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে পুনঃপুনঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন এইপ্রকারে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, তখন সেই দৃশ্যটি কেমন সুন্দর হয়, চিন্তা করিয়া দেখ।*

(২)

গত ১৮৭২ সালের শীতের রজনীতে এক বাঙ্গালী যুবক লণ্ডনের কোন নিভৃত রাজপথ দিয়া আবাসস্থানাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। অদূরে কোন বালকের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না, ক্রন্দনধ্বনি লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক মদ্যপানোন্মত্ত কাফ্রী একটি ইংরাজ-বালককে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে। বালকের

* ভক্তিভাজন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের এই ঘটনা Life of Vidyasagar (By S. C. Mitra) নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইল।

যন্ত্রণাব্যঞ্জক চীৎকারে যুবকের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা সেই পশুপ্রকৃতি কাফ্রীকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন; কাফ্রী প্রহৃত হইয়া পলায়ন করিল। ঘটনার স্থান হইতে বালকটির গৃহ অনেক দূরে অবস্থিত; এই কারণে যুবক তাহাকে একাকী নির্জ্জন পথে যাইতে দিতে পারিলেন না; তিনি বালককে তাহার গৃহে রাখিয়া আসিলেন। বালকের বৃদ্ধ মাতাপিতা বিদেশী যুবকের অদ্ভুত সৌজন্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন।

এই সহৃদয় যুবকের পরিচয় বোধ হয় তোমরা জান না। ইনিই অধুনা পরলোকগত আনন্দমোহন বসু। কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য যখন তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, স্বদেশ-প্রত্যাগমনের প্রায় বিংশতি বৎসর পরে আনন্দমোহন আর এক আশ্চর্য্য ঘটনায় বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদা প্রভাতে তিনি দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, একজন ভদ্রবেশধারী ইংরাজ তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভের আশায় প্রতীক্ষা করিতেছেন। আনন্দমোহন সকল কার্য্য-ত্যাগ করিয়া ভদ্রলোকের সমীপস্থ হইলেন এবং সাদরে অভিবাদন করিয়া দর্শনপ্রার্থীকে উপবেশন করিবার জন্য অনুরোধ

করিলেন। কিন্তু আগন্তুক উপবিষ্ট না হইয়া বলিলেন, "মহাশয়ের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান না করিয়া আমি আসন পরিগ্রহ করিব না। আপনি আমাকে ভুলিয়াছেন, কিন্তু আমি আপনার করুণার কথা বিস্মৃত হই নাই। ইংলণ্ডে আমি যখন একদা এক পানোন্মত্ত কাক্রীর হস্তে নিপীড়িত হইতেছিলাম, তখন আপনিই আমাকে সেই পিশাচের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই ঘটনা মনে হয় কি? আপনার সেই করুণাতেই আমি আজ জীবিত আছি এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছি।"

আনন্দমোহনের পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ইংরাজ ভদ্রলোকটিকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া দেখ, তখন আনন্দমোহন এবং সেই ইংরাজ ভদ্রলোকটি মনে কতই আনন্দ পাইয়াছিলেন। দাতা ও দানগ্রাহীর মধ্যে এই সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, শোকদুঃখময় সংসারটিকে সময়ে সময়ে এত মধুর বলিয়া মনে হয়।

প্রশ্নাবলী।

১। নিন্দনীয়, বিসর্জ্জন নির্য্যাতন,—এই কয়েকটি শব্দ কিপ্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে?

২। কৃতজ্ঞতা-সম্বন্ধে প্রথম ঘটনাটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখ।

৩। সাশ্রুনয়ন, পদধূলিগ্রহণ,—এই দুইটি পদের ব্যাস-বাক্য বল।

রাজপুত্র দুষ্টকুমারের কথা

(বৌদ্ধ "জাতক" গল্পমালা হইতে)

পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি কাশীরাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময়ে এক অসীম-ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণতনয় সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। একদিন এই মনস্বী সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঘটনাক্রমে মহারাজ ব্রহ্মদত্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। সন্ন্যাসীর অসামান্য প্রতিভা মহারাজ ব্রহ্মদত্তের অবিদিত ছিল না। তিনি পরম আগ্রহের সহিত তাঁহাকে নিজ উদ্যানবাটিকায় আহ্বান করিয়া কিয়ৎ-কাল বাস করিবার জন্য সানুনয় অনুরোধ করেন। সন্ন্যাসী তাহাতে সম্মত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মদত্তের এক অত্যন্ত দুর্বিনীত পুত্র ছিল। শৈশব হইতেই দুষ্ট ছিল বলিয়া সকলে তাহাকে "দুষ্টকুমার" এই নাম দিয়াছিল। কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার দৌরাত্ম্য এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সকলেই তাহা অসহ্য বোধ করিতে লাগিল। জ্ঞাতিবর্গ, অমাত্যগণ এবং স্বয়ং মহীপতিও

এই দুঃশীল ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত কুমারকে দমন করিতে পারিলেন না। সুযোগ পাইলেই অমাত্যবর্গের সহিত নাগরিকগণও কুমারকে সদুপদেশ দিতেন, কিন্তু কুমার তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না। তাঁহারা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া নিষেধ করিলেও কুমার তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। পুত্রের ভবিষ্যৎ-চিন্তা করিয়া ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন; অবশেষে স্থির করিলেন যে, সেই সন্ন্যাসী ব্যতীত কেহই তাঁহার পুত্রকে বিনীত করিতে পারিবেন না। তদনুসারে তিনি সন্ন্যাসীকে প্রাসাদে আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন এবং সন্ন্যাসীও রাজকুমারের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত উদ্যানে প্রত্যাগমন করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রথমে কুমারের রুচি ও অভিপ্রায়ে বাধা না দিয়া বরং তাহার অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলেন; এইরূপে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। ক্রমে সন্ন্যাসীর বাক্যে কুমারের আস্থা জন্মিতে লাগিল। একদিন সন্ন্যাসী কুমারকে লইয়া উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, একটি নিম্ববীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে এবং তাহার দুই দিকে দুইটি ক্ষুদ্র পত্র বহির্গত হইয়াছে। তিনি কুমারকে বলিলেন,—"কুমার, একবার দেখ ত ইহার রস কিরূপ?" কুমার একটি পত্র ছেদনপূর্ব্বক রসনাগ্রে নিক্ষেপ করিয়াই ঘোর তিক্তস্বাদ অনুভব করিলেন এবং তাহা ফেলিয়া দিলেন; তাঁহার বমনের উদ্রেক হইল।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"কুমার, এ কি ?" কুমার কহিলেন,— "এই তরু এখনই হলাহল বিষের ন্যায় ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে না জানি ইহা কিরূপ হইবে ! কত লোক না জানিয়া ইহার ফল মুখে দিয়া বিড়ম্বিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে।" রাজকুমার এই বলিয়া সেই অঙ্কুরটি ভূমিতল হইতে উৎপাটন করিয়া করতল দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"রাজকুমার, এই নবোদ্গত নিম্বাঙ্কুর এখনই বিষোপম, পরিণামে না জানি ইহা কিরূপ ভয়ানক হইবে, এই ভাবিয়া তুমি যেমন ইহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে, সেইরূপ তোমার পিতার প্রজাগণও তোমার সম্বন্ধে মনে করিতেছে যে, তুমি শৈশবেই এতাদৃশ দুঃশীল হইয়া উঠিয়াছ, বড় হইয়া রাজ্য লাভ করিলে না জানি তুমি কিরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। তাহারা ভাবিতেছে যে, তোমার আশ্রয়ে বাস করা তাহাদের নানারূপ দুঃখ ও অশান্তির কারণ হইবে। সেইজন্য তাহারা তোমাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে, এমন কি, কেহ কেহ এখনই তোমার প্রাণনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব এখন হইতে দুঃশীলতা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমা দয়া ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে যত্নবান্ হও।"

সন্ন্যাসিপ্রদর্শিত দৃষ্টান্ত নিষ্ফল হইল না। দুর্ব্বৃত্ত রাজকুমার উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধি করিলেন। তিনি বুঝিলেন, স্বভাবের দোষগুলি অল্পবয়সে সংশোধন না করিলে, পরিণামে তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও আত্মীয়-পর সকলেরই অশেষ

দুর্গতির কারণ হইতে পারে। তদবধি "দুষ্টকুমার" অত্যন্ত সুশীল হইলেন এবং মনোযোগপূর্ব্বক বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

প্রশ্নাবলী।

১। দুষ্টকুমারের গল্পটি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত কর।

২। বিষোপম, বিপদ্‌গ্রস্ত,—এই দুইটি পদের সমাস-বাক্য বল এবং কি কি সমাস দ্বারা শব্দগুলি নিষ্পন্ন হইয়াছে, বল।

৩। দুষ্টকুমার কিপ্রকার দুঃশীল ছিলেন, বর্ণনা কর।

অজন্তার গুহা।

অতিপ্রাচীন-কালে যখন মানবগণ গৃহনির্ম্মাণের কৌশল জানিত না, তখন পর্ব্বতের গুহা তাহাদের আবাসস্থান ছিল। প্রকৃতিদেবীর স্বহস্তনির্ম্মিত এই সকল গৃহই তাহাদিগকে শীতাতপে বৃষ্টিবাত্যায় আশ্রয় দিত। তখন মানবগণ লৌহের ব্যবহার জানিত না, তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তরফলকে বল্লমাদি অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বন্য জন্তু বধ করিত এবং কাষ্ঠে কাষ্ঠে সঙ্ঘর্ষণ করিলে যে অগ্নি উৎপন্ন হইত, তদ্দ্বারা মৃগয়া-লব্ধ পশ্বাদির মাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিত।
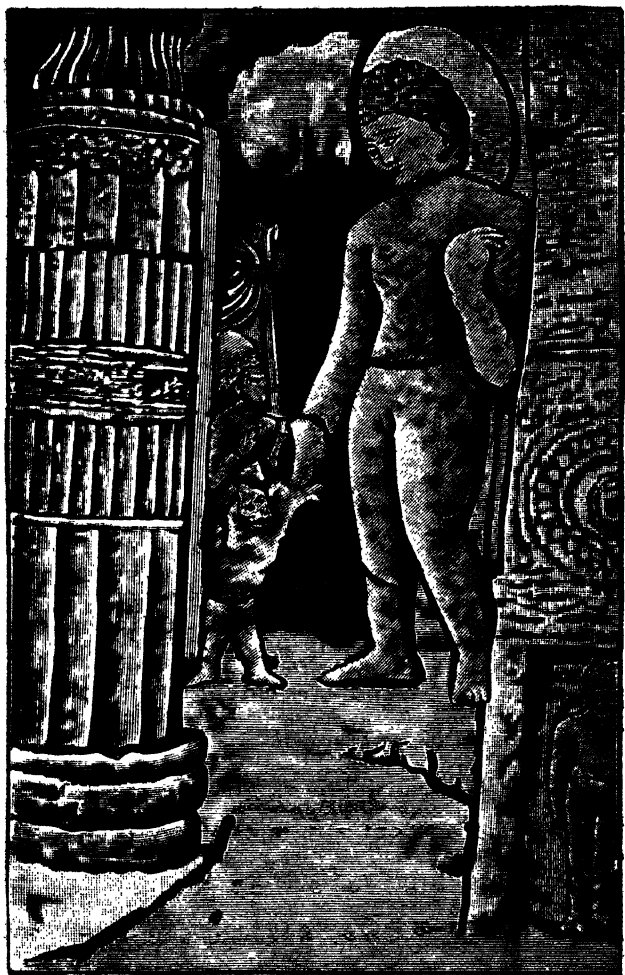
ভিক্ষার্থী বুদ্ধের সম্মুখে মাতা ও পুত্রের খোদিত মূর্ত্তি।

এই যুগের অনেক পরে যখন মানবগণ জ্ঞানে ও বিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তখনও তাহারা প্রকৃতির প্রিয়-নিকেতন পর্ব্বতগুহাগুলিকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। ভগবচ্চিন্তাই যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল এবং নগরের কোলাহল ও সংসারের সুখৈশ্বর্য্য যাঁহারা অপ্রীতিকর জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা বিজন পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। নির্জ্জন পর্ব্বতগুহাই আমাদের দেশের অনেক তাপসের সাধনার স্থান ছিল; পরবর্ত্তী যুগে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণও এই সকল স্থানে সশিষ্যে বাস করিতেন। নিভৃত স্থানে স্বাভাবিক গুহা দুর্লভ হইলে, তাঁহারা স্থপতি ও ভাস্করদিগকে আহ্বান করিয়া কারুকার্য্যপূর্ণ গুহা নির্ম্মাণ করাইয়া লইতেন; দেশের রাজা গুহানির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিতেন। ভারতের সেই তপস্যার যুগ এখন আর নাই এবং তাপসকুলেরও সাক্ষাৎকার এখন দুর্লভ, কেবল তাঁহাদের পরিত্যক্ত মনোরম গুহাগুলিই বর্ত্তমান। কালের করাল-স্পর্শে গুহাগুলির পূর্ব্বশ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি কতিপয় গুহাতে প্রাচীন চিত্রশিল্পের এবং ভাস্করের কার্য্যের যে নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপূর্ব্ব।

আমাদের বর্ণনীয় অজন্তার গুহা হাইদারাবাদের নিজাম বাহাদুরের রাজ্যের অন্তর্গত এবং ইন্দ্রিয়াদ্রি-নামক পর্ব্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ। জলগাঁও রেল-ষ্টেশন হইতে ইহার ব্যবধান প্রায় ত্রিংশৎ ক্রোশ। অধুনা লতাগুল্মে আচ্ছাদিত যে সকল

ভগ্ন বৌদ্ধ-স্তূপ অজন্তার পথের উভয় পার্শ্বে বৃদ্ধ প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান আছে, তাহা দেখিলে স্থানটি যে এককালে বৌদ্ধদিগের আবাসভূমি ছিল, তাহা অনুমান করা যায়। বৌদ্ধেরা কতদিন পূর্ব্বে ইহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ফার্‌গুসন্ সাহেব প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে গুহাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। অপূর্ব্ব চিত্র-সম্পদ্ এবং ভাস্করের কার্য্যের অতুলনীয় ভাণ্ডার বক্ষে ধারণ করিয়া এইগুলি যে কি-প্রকারে এতকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, তাহা বোধগম্য হয় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারী মৃগয়োপলক্ষ্যে ইন্দ্রিয়াদ্রির নিকটে ভ্রমণ করিতে করিতে অজন্তার গুহাবলী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ইহা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। এখন অজন্তার গুহা শিল্পানুরাগীদিগের মহাতীর্থ।

গুহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে দূরে অজন্তার অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা দৃষ্টিগোচর হয়; ইহারই এক অংশ হইতে একটি সুনির্ম্মল ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া ধাবিত হইয়াছে। এই নদীর অবিরাম মৃদু কলধ্বনি এবং কখন কখন দুই একটি পক্ষীর মধুর সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুই এই রমণীয় স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারে না। প্রকৃতির এই নীরবতা ও সৌন্দর্য্য সর্ব্বাংশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের তপস্যার অনুকূল ছিল। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে,

অজন্তার গুহাদ্বারে উপনীত হওয়া যায়। নদীটি গুহার নিকট দিয়াই প্রবাহিতা।

বর্ষাকালে অজন্তার যে সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা বর্ণনাতীত। উর্দ্ধে অনন্ত আকাশে ধূর্জ্জটির জটার ন্যায় পিঙ্গল মেঘমালার মহোৎসব, পদতলে ফেনিল জলধারার বিপুল গর্জ্জন, সম্মুখে বর্ষাস্নাত তরুলতার স্নিগ্ধশ্যামল-শ্রী দর্শকের হৃদয়মন বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দেয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বৎসরের অধিকাংশ সময়ে লোকহিতকল্পে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন, বর্ষা ঋতুই তাঁহাদের বিশ্রাম ও সাধনার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। গ্রাম-নগর ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কেন এই দুর্গম স্থান-গুলিকে সাধনার ক্ষেত্ররূপে মনোনীত করিতেন, তাহা এই সকল স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিলেই অনুমান করা যায়। তাঁহাদের ক্লান্ত মনঃপ্রাণ প্রকৃতির রসধারায় অভিষিক্ত হইয়া অচিরাৎ বল সঞ্চয় করিত।

যে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী পর্ব্বতমালার পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার তীরে দাঁড়াইয়া অজন্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই শ্রেণীবদ্ধ গুহাগুলি দর্শকের নয়ন আকৃষ্ট করে। তথায় প্রবেশ করিলে প্রথমেই একটি দীর্ঘ বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইতে হয় এবং ইহার সম্মুখের প্রাচীরে একটি বৃহৎ দ্বার ও কয়েকটি কারুকার্য্যময় বাতায়ন দেখা যায়। তৎপরে সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই একটি প্রকাণ্ড চতুরস্র প্রকোষ্ঠ নয়নগোচর হয়। এই প্রকোষ্ঠ

গুহার ছাদের আলঙ্কারিক চিত্র।

এবং তাহার চতুর্দ্দিকের শিলাময় স্তম্ভশ্রেণী অজন্তার দর্শনীয় বস্তু। এগুলি একটি অখণ্ড বিশাল পাষাণস্তূপ খোদিত করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। কত পরিশ্রমে এবং ভারতের প্রাচীন শিল্পীদিগের কত চেষ্টায় এই প্রাসাদোপম সুরম্য গুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

গুহার ভাস্করের কার্য্যই একমাত্র দর্শনীয় নহে। ইহার প্রত্যেক প্রাচীরে এবং স্তম্ভে যে সকল চিত্র অঙ্কিত আছে, সেইগুলিই অজন্তার গৌরবের সামগ্রী। গুহার পাষাণ-প্রাচীরে ও ছাদে গোময় ও মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া তাহার উপরে নানাবর্ণে

চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে। দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের এই চিত্রগুলির বর্ণ এখনও অম্লান রহিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন কোন নিপুণ চিত্রশিল্পী এখনি চিত্রাঙ্কনকার্য্য শেষ করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন শিল্পিগণ এই সকল চিরোজ্জ্বল অপূর্ব্ব বর্ণ কি প্রকারে প্রস্তুত করিতেন, তাহা এপর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

গুহারাজির ছাদের চিত্রগুলি অপূর্ব্ব-কারুকার্য্যময়। সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, যেন একখানি বহুমূল্য শালের চন্দ্রাতপ বিস্তৃত রহিয়াছে। প্রত্যেক ছাদেরই মধ্য-স্থলে একটি বৃহৎ শ্বেত শতদল এবং তাহারই চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে সজ্জিত মরালচক্রবাক-মিথুন, ময়ূরাদি পক্ষীর দল বা পদ্মবনশয়িত করিযূথ। এতদ্ব্যতীত ছাদের চারি কোণে নানাজাতীয় লতাপাতার চিত্রও দেখা যায়। চিত্রগুলিতে বর্ণের অপূর্ব্ব সমাবেশ এবং সেগুলির জীবন্ত ভাব দেখিলে, দর্শকমাত্রেই পুলকিত হইয়া পড়েন।

গুহাপ্রাচীরের চিত্রগুলি কিছু স্বতন্ত্র। দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের নাগরিকগণের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ঘটনার পরিচয় এই সকল চিত্র হইতে সংগ্রহ করা যায়। কোন চিত্রে রাজা রাজ্ঞী সভাসৎপরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং সম্মুখে কোন অপরাধী যুক্তকরে দণ্ডায়মান; তাহার বিচার চলিতেছে। কোথাও বীণা হস্তে গায়কগায়িকাগণ সঙ্গীত-তৎপর, কোথাও নবীনরাজার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন

হইতেছে, অন্ধ স্থবির প্রভৃতি প্রার্থীর দল প্রফুল্লবদনে অভিষেকের স্থানে দ্রুতপদে চলিতেছে। কোথাও নৃত্য-গীত-বাদ্যভাণ্ডের সহিত বরযাত্রীয়-দের শোভাযাত্রা এবং লাজবর্ষণ-নিরতা বরাঙ্গনা-দিগের সলজ্জ সকৌতূহল মুখ-চ্ছবি, কোথাও বিপুল জনসঙ্ঘ ঢকা ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া সং-কীর্ত্তনে রত। এইরূপ শত শত চিত্রে গুহাপ্রাচীর-গুলি পরিশোভিত হইয়া আছে। চিত্রগুলি এতই স্বাভাবিক যে, গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই দর্শকের মনে হয় যেন, তিনি আমাদের কোন প্রাচীন কবির বর্ণিত এক রাজ-ধানীতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেই অতিপ্রাচীন যুগের

গুহায় চিত্রিত বাদকদল।

নাগরিকদিগের সুখদুঃখ ও উৎসবব্যসনের সহিতও যেন তাঁহার যোগ আছে।

যে সকল গুহায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ ধ্যানার্চ্চনা করিতেন, সেগুলিরও প্রাচীর নানা চিত্রে শোভিত। বুদ্ধদেবের জীবনের নানা ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই সকল চিত্র অঙ্কিত। কোথাও ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ পদ্মাসনে আসীন; তাঁহার মুখশ্রী অগ্নি-শিখার ন্যায় দীপ্ত। কোথাও তাঁহার গৃহ-ত্যাগের করুণ দৃশ্য। কোথাও ভিক্ষুবেশী বুদ্ধ দণ্ডায়মান এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে আশী-র্ব্বাদপ্রার্থী নরনারীর জনতা। এই শ্রেণীর প্রত্যেক চিত্রে বুদ্ধদেবের যে সকল শান্তোজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত আছে, তাহা দেখিলে দর্শকের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া পড়ে এবং

গুহায় চিত্রিত স্তাবক।

ভারতের সেই মহাতাপসের চরণে মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছা হয়।*

প্রশ্নাবলী।

১। আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা কেন লোকালয় হইতে দূরে গুহাতে বাস করিতেন? অজন্তার গুহা কত দিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল? এই গুহা কেন এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে?

২। গুহা-প্রাচীরে অঙ্কিত দুই একটি চিত্রের পরিচয় প্রদান কর।

৩। "পদ্মাসন" এই শব্দটির অর্থ কি? ইহার অপর কোন অর্থ আছে কি? যদি জানা থাকে, তবে বল।

৪। চক্রবাকমিথুন, চন্দ্রাতপ, স্তব্ধ-সৌন্দর্য্য, নির্ঝরিণী, জনসঙ্ঘ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ,—এই কয়েকটি পদের অর্থ বল?

৫। অজন্তার নিকটবর্ত্তী স্থানের বর্ষার সৌন্দর্য্য নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

---

* এই রচনায় অনেক উপাদান প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের "অজন্তা"-নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রকৃতির সম্মার্জ্জকবর্গ।

(প্রাণিতত্ত্বসম্বন্ধী)

আধুনিক বৃহৎ কর্ম্মশালাগুলিতে প্রতিদিনই যে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী কার্য্য করে, তাহাদের কার্য্যের মধ্যে শৃঙ্খলতা আছে। যদি কোন কর্ম্মশালা বস্ত্রবয়নের জন্য স্থাপিত হইয়া থাকে, তবে সকলেই বস্ত্রবয়নে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করে না; শ্রমজীবিগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া নানা কার্য্য চালায় এবং শেষে দেখা যায়, বহু বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রকৃতিদেবী তাঁহার কর্ম্মশালায় যে সকল শ্রমজীবী নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাহাদেরও মধ্যে শ্রমবিভাগ বর্ত্তমান। সূর্য্য এই শ্রমজীবিগণের অন্যতম। কোটি কোটি ক্রোশ দূরে থাকিয়া ইহা তাপালোকের যে অবিরাম ধারা ভূমণ্ডলের দিকে চালনা করিতেছে, তাহাই জলকে বাষ্পীভূত করিয়া মেঘে পরিণত করে এবং সৌরতাপচালিত বায়ুপ্রবাহ সেই মেঘকে যথাস্থানে চালনা করিয়া বর্ষণ করায়। অনন্তর সেই অমৃতোপম বারিধারায় পুষ্টাঙ্গ হইয়া ভূমণ্ডলের তরুলতাগুল্ম ও ওষধিগণ কি প্রকারে ফুলে ফলে ও শস্যে সৃষ্টি রক্ষা করে, তাহা আমরা নিয়তইদেখিতে পাই।

এখন মনে করা যাউক, যেন সূর্য্য তাহার সহস্র রশ্মি সংহরণ করিয়া, কিছুকালের জন্য পৃথিবীকে নিবিড় অন্ধকারে নিমগ্ন রাখিল। এখন এই অবস্থা বৃষ্টিপাত বন্ধ করিয়া, নদীগুলিকে শুষ্ক করিয়া ও শস্যক্ষেত্রগুলিকে মরু-ভূমিতে পরিণত করিয়া, যে সকল মহানর্থের সূচনা করিবে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

সূর্য্য প্রকৃতির কর্ম্মশালার প্রধান কর্ম্মী; সুতরাং ইহার কার্য্যকলাপ অনায়াসেই আমাদের গোচরীভূত হয়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র বৃহৎ কীটপতঙ্গ এবং নানাবিধ উদ্ভিদ্ ভূমণ্ডলের কর্ম্মশালায় থাকিয়া নীরবে যে সকল কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া যাইতেছে, তাহা সহসা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। ঘটিকাযন্ত্রে যে সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ চক্র সংলগ্ন থাকে, তাহাদের কোনটিই অনাবশ্যক নয়, সকলেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবর্ত্তিত হইয়া, কর্ত্তব্য সমাপন করে বলিয়াই যন্ত্রের কার্য্য চলে। এখন ইহা হইতে একটি ক্ষুদ্র চক্র বিমুক্ত করিলে যেমন সমস্ত যন্ত্রই বিকল হইয়া পড়ে, সেইপ্রকার যাহারা প্রকৃতির কর্ম্মশালায় অতিক্ষুদ্র কর্ম্মী তাহাদের অভাবেও সৃষ্টিরক্ষা অসম্ভব হয়।

মহীলতা অর্থাৎ কেঁচো তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট প্রাণী। মনুষ্য বা পশুপক্ষীর দেহে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, ইহাদের দেহে তাহার একান্ত অভাব। তৃণাদির কোমল পত্র ও মৃত্তিকাই ইহাদের ভক্ষ্য। ইহারা ভুক্ত মৃত্তিকা হইতে সারভাগ গ্রহণ

করিয়া, অবশিষ্ট অংশ পাকস্থলী হইতে নির্গত করিয়া দেয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, নিম্নের মৃত্তিকা উত্থিত করিয়া এই তুচ্ছ প্রাণী ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। অনুর্ব্বর পর্ব্বতময় প্রদেশকে কৃষিযোগ্য করিবার ইহারা পরম সহায়। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক দারুউন সাহেব বলিয়াছিলেন, যদি কোন কালে ধরাতলে এই প্রাণীর অস্তিত্ব লোপ হয়, তবে ভূতলের উর্ব্বরতাশক্তির হ্রাস হইবার সম্ভাবনা আছে। কেবল কেঁচো নয়, প্রজাপতি মধুমক্ষিকা প্রভৃতি যে সকল প্রাণীকে আমরা ইতস্ততঃ উড্ডীন থাকিতে দেখি, তাহারাও নীরবে সৃষ্টিরক্ষার সহায়তা করে।

কোন স্থানে অধিক লোকের সমাগম হইলে, তাহা নানা-প্রকারে অপরিচ্ছন্ন ও আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া পড়ে। আধুনিক বৃহৎ নগরগুলির জনসংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়, সুতরাং সেইস্থানে যথেষ্ট আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয়। আবর্জ্জনারাশি দূর করিবার সুব্যবস্থা না থাকিলে, নগরের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য উভয়ই লোপ পাইয়া যায়। এজন্য রাজা রাজবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তদনুসারে শত শত শ্রমজীবী এবং বহু অশ্ব ও গো-যান নগরের আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য নিযুক্ত আছে।

মনুষ্য নিজের বাসস্থান ও জনাকীর্ণ নগরের আবর্জ্জনা দূর করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু নগরের বাহিরে এবং নির্জ্জন নদীপর্ব্বতে ও দুর্গম অরণ্যে নিয়তই যে সকল আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইতেছে, তাহা নষ্ট করিবার সামর্থ্য

মনুষ্যের নাই ; অথচ এইগুলি নষ্ট না করিলে অল্পকালের মধ্যে ধরাতল বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। প্রতিদিন পৃথিবীর নানা অংশে যে কোটি কোটি প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত্যু হইতেছে, তাহাদের দেহ যদি বিনষ্ট না হইয়া ভূপৃষ্ঠে ক্রমাগত সঞ্চিত হইতে থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর অবস্থা যে কিপ্রকার হইত, তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। যাহা মনুষ্যের অসাধ্য, প্রকৃতিদেবী তাহা অতি সহজে সুসম্পন্ন করেন। প্রকৃতির এই বিশাল শিল্পশালাকে কোন্ কোন্ কর্ম্মী কিপ্রকারে আবর্জ্জনাবর্জ্জিত করিয়া পরিচ্ছন্ন রাখে, আমরা এই পাঠে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

গো-মহিষাদি বৃহৎ প্রাণীর মৃতদেহ শৃগাল কুক্কুর কাক প্রভৃতি পশুপক্ষিগণ কিপ্রকারে নষ্ট করিয়া পরম উপকার সাধন করে, তাহার বিশেষ পরিচয়প্রদান নিষ্প্রয়োজন। এই সকল মাংসাশী প্রাণী মৃতদেহের সন্ধানে চারিদিকে অবিরাম বিচরণ করে। পরমেশ্বর শকুনি-প্রভৃতিকে এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দান করিয়াছেন যে, অর্দ্ধক্রোশ দূরে থাকিয়াও তাহারা ক্ষুদ্র প্রাণীর লুকায়িত মৃতদেহ অনায়াসেই দেখিতে পায়। শৃগাল-কুক্কুরও তাহাদের প্রবল ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে অল্পায়াসে মৃতদেহ আবিষ্কার করে। মৃতদেহ-সৎকারের এই ব্যবস্থায় উভয় পক্ষই পরম লাভবান্ হয় ; মাংসাশী প্রাণিগণ উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পায় এবং দেশের লোকেরা গলিত

মৃতদেহের অস্বাস্থ্যকর পূতিগন্ধের উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

মুষিক ভেক পক্ষী প্রভৃতি ক্ষুদ্রপ্রাণীর মৃতদেহের সৎকারকার্য্যে কাকশকুনি বা শৃগালকুক্কুরের সাহায্য পাওয়া যায় না। কয়েকজাতীয় কীটকে এই কার্য্যের প্রধান সহায় হইতে দেখা যায়। কঠিন বর্ম্মে আবৃত এই কীটগুলি কোমল মৃত্তিকাতলে সর্ব্বত্র অবস্থান করে এবং মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকার উপরে উঠিয়া বাহিরের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর মৃতদেহ দেখিতে পাইলে, ইহারাই দলে দলে আসিয়া তাহা মৃত্তিকায় আবৃত করে। বলা বাহুল্য, মৃতদেহের এই সমাধিকার্য্য তাহারা নিঃস্বার্থভাবে করে না; উদরপূর্ত্তি করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্র উদরগুলি পূর্ণ করিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না। ক্ষুন্নিবৃত্তির পরে মৃতদেহের যাহা অবশিষ্ট থাকে, ভবিষ্যৎ সন্তানসন্ততির ব্যবহারার্থ তাহা সঞ্চিত রাখিবার জন্য ইহাদের চেষ্টা হয়। এই কীটগুলি একেবারেই পূর্ণাবয়ব সন্তান প্রসব করে না। প্রথমে ডিম্ব প্রসব করে এবং তাহা পরিণত হইলে ডিম্ব হইতে শুঁয়াপোকার আকারের কীট নির্গত হয়। ইহারাই নানা পরিবর্ত্তনের পরে পূর্ণাঙ্গ কীট হইয়া দাঁড়ায়। যাহা হউক, মৃত্তিকায় আচ্ছন্ন করার পরে সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে, স্ত্রীকীটগণ অবশিষ্ট মৃতদেহের উপরে বহু ডিম্ব প্রসব করিয়া যথাস্থানে চলিয়া যায়। ইহার পরে স্ত্রী বা পুরুষ কোন

কীটই আর ডিম্বের সন্ধান করে না। যথাসময়ে ডিম্বগুলি হইতে শুঁয়াপোকার ন্যায় যে সকল ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি হয়, তাহারা সম্মুখেই স্তূপীকৃত খাদ্য পাইয়া পরমানন্দে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। এইপ্রকারে মৃত্তিকাবৃত অবশিষ্ট মৃতদেহ নিঃশেষ হইয়া যায়।

মৃতদেহ নষ্ট করিবার এই উপায় কেমন সুন্দর! কাহাকেও একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না, অথচ ধরাতলের একটি বৃহৎ আবর্জ্জনা দূর হইয়া যায়। কীটগণ শ্রম করিয়া মৃত্তিকা উত্তোলন করে সত্য, কিন্তু সেই শ্রমের বিনিময়ে যে পুরস্কার লাভ করে, তাহাতে উহারা পরমানন্দিত থাকে। শস্যক্ষেত্র, মুক্তপ্রান্তর এবং বৃক্ষবহুল নির্জ্জন স্থানই মূষিক পক্ষী প্রভৃতির বাসস্থান। পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র কীট মৃত প্রাণিদেহ নষ্ট না করিলে, প্রান্তর বা অরণ্যের বায়ু কখনই স্বাস্থ্যপ্রদ হইত না।

গোময় ও পুরীষাদি যখন পচিতে আরম্ভ করে, তখন ইহাদেরও পূতিগন্ধ বায়ুকে যথেষ্ট দূষিত করে। এই পদার্থ-গুলিকে নষ্ট করিবার জন্য প্রকৃতির আর এক দল কর্ম্মী কীট সর্ব্বদা তৎপর থাকে। গ্রাম্যপথে ভ্রমণকালে প্রায় দেখা যায়, একপ্রকার কীট ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার কোন পদার্থ তাহাদের পশ্চাতের পদযুগল দ্বারা আবর্ত্তিত করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহারাই গোময় ও পুরীষাদিনাশক কীট। কোন স্থানে গোময়াদি পতিত হইলে, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া ইহারা

সম্মুখ ও পশ্চাতের পদ দ্বারা ঐ সকল পদার্থের গুটিকা রচনা করিতে আরম্ভ করে এবং সেগুলিকে আবাসগর্ত্তে বহন করিয়া লইয়া যায়। ইহার পরে উপভোগের সময় উপস্থিত হয়। দুই তিনটি গুটিকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই, তাহা আহার করিয়া ইহারা অনায়াসে দুই সপ্তাহ আনন্দে যাপন করিতে পারে।

পৃথিবীর স্থলভাগ যেমন পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ এবং তরুলতা প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদে পূর্ণ আছে, সমুদ্র নদী পুষ্করিণী প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয়গুলিতেও সেইপ্রকার বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ্ রহিয়াছে। স্থলচর প্রাণীর ন্যায় ইহারাও মৃত্যুর অধীন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা বহু মৎস্যপূর্ণ নদী বা পুষ্করিণীতে কদাচিৎ মৃত মৎস্য বা মৃত ভেক দেখিতে পাই। এখানেও প্রকৃতির আর একদল কর্ম্মীকে জলের আবর্জ্জনা দূর করিতে দেখা যায়। নদীপুষ্করিণীর বোয়াল-প্রভৃতি মৎস্য এবং ছোট কুম্ভীর কচ্ছপ প্রভৃতি অপর জলচর প্রাণী এই কর্ম্মীদিগের মধ্যে প্রধান। জলের কোন অংশে কোন গলিত জীবাবশেষের সন্ধান পাইলেই, উহারা দ্রুতগতিতে তথায় উপস্থিত হয় এবং অবিলম্বে তাহা নিঃশেষে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। কখন কখন এক-প্রকার চিংড়ী মৎস্যকেও এ কার্য্যে যোগ দিতে দেখা যায়।

মৃত জলচরদেহই জলাশয়ের একমাত্র আবর্জ্জনা নয়। বৃহৎ নগরের নিকটবর্ত্তী নদী ও পুষ্করিণীতে বহু মলিন বস্ত্রাদি

ধৌত করায় জল নিয়তই দূষিত হইতেছে। এইপ্রকারে কয়েক সপ্তাহ জলাশয়ের জল দূষিত হইতে থাকিলে, তাহার অবস্থা যে কিপ্রকার ভয়ঙ্কর হইয়া পড়ে, তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। এই আবর্জ্জনানাশেও নানাজাতীয় মৎস্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়। সহস্র নরনারীর স্নানে পুষ্করিণী বা নদীর বা জলে যে তৈল মিশ্রিত হয়, তাহাও কয়েকজাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্যের প্রধান ভক্ষ্য।

প্রশ্নাবলী।

১। শকুনিপ্রভৃতি পক্ষীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি কেন আছে?

২। কীটগণ গোময়পুরীষাদি কিপ্রকারে নষ্ট করে?

৩। জলাশয়ে কোন বস্তু পচিতে থাকিলে, তাহা কিপ্রকারে নষ্ট হয়?

ব্যাঘ্র।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল গভীর অরণ্যে ব্যাঘ্র বাস করে; গ্রামের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র বনেও ইহারা লুক্কায়িত থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের যে সকল স্থান অত্যন্ত শীতল, সেই স্থানে ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। হিমাচলের যে

সকল অরণ্য সমুদ্রতল হইতে ছয় হাজার ফিট্ উচ্চে অবস্থিত, সেখানে কদাচিৎ ব্যাঘ্র দৃষ্ট হয়। এশিয়া-খণ্ডের অপর প্রদেশে ব্যাঘ্র আছে বটে, কিন্তু তাহাদের আকৃতিপ্রকৃতি আমাদের দেশের ব্যাঘ্রের অনুরূপ নয়।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ ব্যাঘ্রকে বিড়ালের জাতিভুক্ত করিয়াছেন। ব্যাঘ্রের আকৃতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিলে, ইহার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ইহাদিগকে দেখিলে সত্যই বিড়ালের কথা মনে পড়িয়া যায়। বিড়ালগণ পদ-চতুষ্টয়ের তীক্ষ্ণাগ্র নখরগুলিকে "থাবা"র ভিতরে যেমন লুক্কায়িত রাখিতে পারে এবং প্রয়োজন অনুসারে বহির্গত করিতে পারে, নখরগুলিকে লুক্কায়িত রাখিবার এবং বহির্গত করিবার সেইপ্রকার ব্যবস্থা ব্যাঘ্রের "থাবা"তেও অবিকল দৃষ্ট হয়। বিড়ালের পদতলে পিণ্ডাকার কোমল মাংস সংযোজিত থাকে, এই কারণে ইহারা নিঃশব্দে বিচরণ করিতে পারে। ব্যাঘ্রের পদতলে এইপ্রকার মাংসপিণ্ড দেখা যায়, ইহারাও বিড়ালের ন্যায় নিঃশব্দে চলাফেরা করে। মার্জ্জারের লোমে শ্বেত, কৃষ্ণ, পাটল প্রভৃতি বর্ণের যে বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়, ব্যাঘ্রের লোমে তাহা দৃষ্ট হয় না। ব্যাঘ্রের গাত্রে পিঙ্গল লোমের উপরে কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ দাগ বা চক্রাকার কৃষ্ণচিহ্ন ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় না। কিন্তু পিঙ্গল রোমের উপরে সেই ঘোরকৃষ্ণ লম্বা দাগগুলিকে বড় সুন্দর দেখায়। ব্যাঘ্রমাত্রেরই কণ্ঠদেশ বক্ষঃস্থল

এবং উদরের নিম্নের লোমগুলির বর্ণ শ্বেত এবং এইগুলি দেহের অপরাংশের লোমের তুলনায় কিঞ্চিৎ দীর্ঘতর। বিড়ালজাতি-ভুক্ত হইলেও ব্যাঘ্রের চক্ষু বিড়ালচক্ষুর ন্যায় নহে, ইহাদের চক্ষুর উজ্জ্বল তারা মানবচক্ষুর ন্যায়ই গোলাকার।

ব্যাঘ্রের দন্তবিন্যাসে বিশেষত্ব আছে। শিকার আয়ত্ত করিবার জন্য চারিটি দীর্ঘ সূক্ষ্মাগ্র ভেদক-দন্ত এবং আহার্য্য খণ্ডিত করিবার জন্য কয়েকটি ছেদন-দন্ত হনুদ্বয়ে সজ্জিত থাকে। হনুর প্রান্তে চর্ব্বণ-দন্তও আছে বটে, কিন্তু উদ্ভিজ্জাশী প্রাণীদিগের দন্তের ন্যায় সেগুলি ঘনবিন্যস্ত নয়। আমরা যেমন হনুদ্বয়কে দক্ষিণে ও বামে সঞ্চালিত করিয়া আহার্য্য চর্ব্বণ করি, ব্যাঘ্র তাহা করে না; উদ্ভিজ্জাশী এবং রোমন্থক প্রাণীদিগের ন্যায় নিম্ন চওয়ালের অস্থিগুলিকে পাশাপাশি সঞ্চালনে ইহারা একেবারে অসমর্থ। এই কারণে ব্যাঘ্রের চর্ব্বণ-দন্তের অধিক প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না, তীক্ষ্ণাগ্র ভেদক-দন্ত এবং ছেদন-দন্তে উহাদিগের আহারকার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হয়।

ব্যাঘ্রের ঘ্রাণ ও শ্রবণের শক্তি অত্যন্ত প্রবল। দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়েরই গঠন মানবের ঘ্রাণ ও শ্রবণেন্দ্রিয় অপেক্ষাও অধিকতর পরিণত ও জটিল; কিন্তু এই প্রাণীদিগের পাকযন্ত্র জটিলতাবর্জ্জিত। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন,

উদ্ভিজ্জভোজী প্রাণীদিগেরই পাকযন্ত্রে জটিলতা অধিক; কেবল মাংসাহার করিয়া যে সকল প্রাণী জীবনধারণ করে, তাহাদিগের পাকযন্ত্রে প্রায় জটিলতা থাকে না। ব্যাঘ্র আমিষাশী, এই কারণে ইহাদের পাকযন্ত্র জটিল নহে।

সুন্দরবন-অঞ্চলে যে সকল বৃহৎ ব্যাঘ্র বাস করে, তাহাদের কোন কোনটিকে লাঙ্গুল সহ প্রায় আট হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু চক্রাকার কৃষ্ণ-চিহ্নে যাহাদের দেহ চিত্রিত সেই চিতাব্যাঘ্রগুলিকে কদাচিৎ ছয় হস্তের অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। উচ্চতায় সুন্দর-বনের বৃহৎ ব্যাঘ্রগুলিকে কখন কখন সার্দ্ধদ্বিহস্ত হইতেও দেখা গিয়াছে। পিঙ্গল ও ঘোর-কৃষ্ণবর্ণের লোমে আবৃত এই শ্রেণীর বৃহদাকার ভীষণদর্শন প্রাণিগণ যখন শিকার আক্রমণে উদ্যত হয়, তখন সাহসিক পুরুষের অন্তঃকরণেও ভীতির সঞ্চার হয়। ভারতবর্ষের পার্ব্বত-স্থানের ব্যাঘ্র আকারে বৃহৎ হয় না বটে, কিন্তু ইহারা সমতলদেশবাসী ব্যাঘ্র অপেক্ষা অধিকতর বলবান্।

মেষ মহিষ হস্তী প্রভৃতির দেহ শ্লথমাংস-বহুল, কিন্তু ব্যাঘ্রদেহে শ্লথ মাংসের অংশ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; দৃঢ় মাংসপেশী এবং স্থূল অস্থি দ্বারাই ইহাদের দেহের অধিকাংশ গঠিত। এইজন্যই ব্যাঘ্র এতাদৃশ বলবান্ এবং লম্ফনপটু। অতিকায় হস্তিগণ ব্যাঘ্রের অপেক্ষা বলশালী বটে, কিন্তু দেহের গুরুত্বাধিক্য-বশতঃ সমগ্র শক্তি কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারে

না, লম্ফপ্রদানেও ইহারা অসমর্থ। পঞ্চহস্ত-পরিমিত নালা হস্তী লম্ফপ্রদানে পার হইতে পারে না; কিন্তু ব্যাঘ্রগণ তাহার পেশীবহুল দৃঢ় পদচতুষ্টয়ের সাহায্যে দীর্ঘ লম্ফন প্রদান করিতে পারে।

ব্যাঘ্র মাংসাশী প্রাণী। ইহারা দুর্ব্বলতর প্রাণী-দিগকে বধ করিয়া তাহাদের মাংসে উদরপূর্ত্তি করে। মৃগয়াকারীরা বলেন, ব্যাঘ্র সদ্যোমৃত প্রাণীর মাংস অপেক্ষা গলিত মাংসই প্রিয়তর জ্ঞান করে। এক শিকারী এই-সম্বন্ধে একটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সুন্দরবনের কোন স্থানে রাত্রিতে কয়েকটি ছাগ বন্ধন করিয়া, নিকটেই কয়েকখণ্ড গলিত মাংস রাখিয়া দিয়াছিলেন। ছাগের চীৎকারে ব্যাঘ্র আসিল, কিন্তু সে ছাগগুলিকে স্পর্শ না করিয়া গলিত মাংসখণ্ডগুলি মুখে করিয়া পলায়ন করিল। গবাদি বৃহৎ প্রাণী বধ করিয়া ব্যাঘ্র উক্ত পশুমাংস তিন চারি দিন আহার করিতেছে, এপ্রকার বহু ঘটনাও দেখা গিয়াছে। মনুষ্যমাংস ব্যাঘ্রের অতিপ্রিয়। বার্দ্ধক্যাদি-প্রযুক্ত ব্যাঘ্রগণ যখন বন্যপশু-বধে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকে প্রায়ই নরখাদক হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় তাহারা আরণ্য ভূমি ত্যাগ করিয়া গ্রামোপান্তের ক্ষুদ্র বনে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কোন নিঃসহায় পথিককে নিকটে পাইলেই আক্রমণ করে। ব্যাঘ্রের অত্যাচারে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর বহু লোক কালগ্রাসে পতিত হয়।

গত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় আট শত ব্যক্তির এইপ্রকারে অপমৃত্যু হইয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। সেই সময় প্রতি বৎসর কেবল বঙ্গদেশে প্রায় সাত শত ব্যক্তি ব্যাঘ্রের আক্রমণে নিহত হইত। সদাশয় ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে কিপ্রকারে
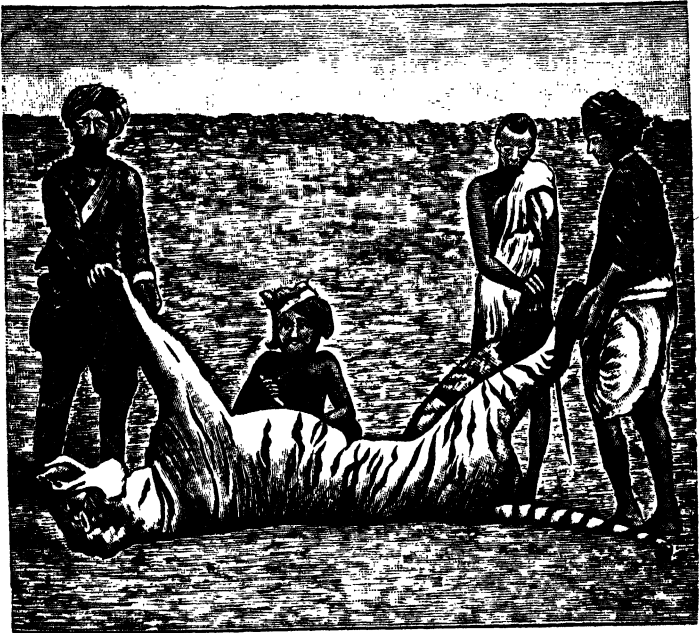
শিকারান্তে শিকারিগণ ব্যাঘ্রের গাত্র হইতে চর্ম্ম উন্মোচন করিতেছে।

এই অপমৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে, ইহা হইতে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। রেলপথের ক্রমিক বিস্তারাদি দ্বারা

দেশবিদেশে অনায়াসে গমনাগমনের সুবিধা হওয়ায়, শ্বাপদ-সঙ্কুল আরণ্যভূমিগুলি এক্ষণে কৃষিক্ষেত্রে বা নগরাদিতে পরিণত হইয়াছে, কাজেই ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণিগণ লুক্কায়িত থাকিবার স্থানের অভাবে লোকালয় হইতে ক্রমেই দূরে তাড়িত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ব্যাঘ্র বধ করার জন্য রাজসরকার হইতে শিকারিগণ যে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, ইহাও ব্যাঘ্রের অত্যাচার-নিবারণের অন্যতম কারণ। শিকারিগণ গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক এইরূপে পুরস্কৃত হইবার জন্য অনেক সময়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যাঘ্র শিকার করে।

ব্যাঘ্রী প্রায় চারিমাস গর্ভধারণ করিয়া, এক কালে দুই হইতে পাঁচটিপর্য্যন্ত শাবক প্রসব করে। কিন্তু প্রতি-বৎসরই ইহাদের সন্তান হয় না, তিন বৎসরের ব্যবধানে ইহারা এক-একবার সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। গবাদির শাবকগণ যেমন জন্মের কয়েক মাস পরেই আত্মনির্ভরক্ষম হইয়া মাতার সহিত সম্বন্ধ ছেদ করে, ব্যাঘ্রশাবকগণ তাহা করে না। জন্মের পরে তিন বৎসর ইহারা মাতার সঙ্গেই থাকে; মাতাও অতিযত্নে ইহাদিগকে পালন করে। পুংব্যাঘ্র শাবকদিগের পরমশত্রু। শাবক দেখিলেই ইহারা তাহাদিগকে বধ করিয়া আহার করে; এইজন্য ব্যাঘ্রী শাবকগুলিকে পুং-ব্যাঘ্রের কবল হইতে অতিসাবধানে রক্ষা করিয়া থাকে। শৈশব হইতে বাল্যে পদার্পণ করিলে, মানবশিশুর সম্মুখের দন্ত স্খলিত হইয়া যায় এবং শূন্য স্থানে নূতন দন্তের উদ্গম

হয়। ব্যাঘ্রশাবকেও অবিকল তাহাই দেখা যায়। যে তিন বৎসর ইহারা মাতার তত্ত্বাবধানে থাকে, তাহাই ইহাদের শৈশব। এই কাল উত্তীর্ণ হইলে ইহাদের সম্মুখের কয়েকটি দন্ত স্খলিত হইয়া যায় এবং তৎস্থানে দৃঢ়তর নূতন দন্ত জন্মে। এইপ্রকারে প্রকৃতিদত্ত নূতন অস্ত্রে সজ্জিত ও স্বাবলম্বী হইয়া ইহারা বনভূমিতে বিচরণ আরম্ভ করে।

ব্যাঘ্রশাবক দেখিতে অতি সুন্দর এবং শৈশবে পোষ মানে। ষ্টার্ন্‌ডেল্‌-নামক কোন ইংরাজ ভদ্রলোক দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করিয়া পশ্বাদির জীবনের ইতিহাস-সংগ্রহে বহু শ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার "জালিম্‌"-নামক স্বহস্ত-পালিত একটি ব্যাঘ্রশাবক ছিল। শৈশবে জালিম্‌ পালিত কুক্কুরের ন্যায়ই সাহেবের অনুবর্ত্তন করিত। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত সেটি পূর্ণাবয়ব ব্যাঘ্রে পরিণত হইলে, তিনি তাহাকে আর মুক্তাবস্থায় রাখিতে সাহস করেন নাই; তখন তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। বন্ধনদশাতেও সে কাহারও অনিষ্ট করিত না; দর্শক নিকটবর্ত্তী হইলে কুক্কুরের ন্যায় পদতলে লুণ্ঠিত হইতে থাকিত। ষ্টার্ন্‌ডেল্‌ সাহেব ইহাকে কখনও আমমাংসের স্বাদ গ্রহণ করিতে দিতেন না। শেষে এই ব্যাঘ্রটি ইংলণ্ডের পশুশালায় প্রেরিত হইয়াছিল।

আমাদের দেশের বৃহৎ নগরগুলিতে সময়ে সময়ে ব্যাঘ্রের সহিত মনুষ্যের নানাবিধ ক্রীড়া দেখান হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায়, ভয়প্রদর্শন করিলে বা প্রহারোদ্যত হইলে

ব্যাঘ্র কিঞ্চিৎ বশীভূত হয়; কিন্তু বয়স্ক ব্যাঘ্র কখনই কুক্কুরের ন্যায় মানবের অনুগত হয় না। ক্রীড়াপ্রদর্শকগণকে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়, একটু সুবিধা পাইলেই ব্যাঘ্র পালককে বধ করিতে দ্বৈধ করে না। ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক পালকের প্রাণনাশের অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

হরিণ হস্তী প্রভৃতি পশু দলবদ্ধ হইয়া অরণ্যে বাস করে এবং অপর বলবান্ প্রাণীদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে, কিন্তু ব্যাঘ্রদিগকে কদাচিৎ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা যায়। ইহাদের বাসস্থানও দীর্ঘকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে না। অরণ্যে বা গ্রামের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র বনে ইহারা রাত্রিতে বিচরণ করে এবং অরণ্যের যে অংশে হরিণ-প্রভৃতি দুর্ব্বল প্রাণী সুলভ, সেই স্থানে কোন জলাশয়ের তীরে বাস করে। কিন্তু খাদ্য দুর্লভ হইয়া পড়িলে বা অপর কোন ব্যাঘ্র সেখানে উপস্থিত হইলে, তাহারা অবিলম্বে সেই অরণ্য ত্যাগ করিয়া বনান্তরে গমন করে।

কাঁচপোকা যখন তৈলপায়িকা অর্থাৎ আরসুলা শিকার করে, তখন তাহার দেহের যে কোন অংশে হুল প্রবেশ করায় না। যে অংশে সামান্য আঘাত লাগিলে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া যায়, শিকারী কাঁচপোকা আরসুলার দেহের সেই-প্রকার কোন অংশে হুল প্রবেশ করাইয়া দেয়; ইহাতে আরসুলা অবশাঙ্গ হইয়া পড়িলে কাঁচপোকা অনায়াসে তাহার দীর্ঘ শুঁয়া ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে। কেবল কাঁচপোকার

শিকারেই যে, এইপ্রকার কৌশল আছে তাহা নহে। মাংসাশী সকল প্রাণীই শিকার করিবার কৌশল অবগত আছে। বিড়ালগণ যখন পক্ষীকে আক্রমণ করিতে যায়, তখন ঐপ্রকার কৌশলই অবলম্বন করে। প্রথমে শিকারের গ্রীবাদেশের উপরে বিড়ালের লক্ষ্য থাকে; পরে দন্তের সাহায্যে গ্রীবা ধরিয়া সবলে পক্ষীকে এমন ঝাঁকুনি দিতে থাকে যে, তাহাতে পক্ষীর মেরুদণ্ডের অস্থিমালা স্থানভ্রষ্ট হইয়া যায়। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলির স্থানচ্যুতি ঘটিলে, কোন প্রাণীরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সঞ্চালনের শক্তি থাকে না। দুর্ব্বল পশ্বাদি আয়ত্ত করিবার জন্য ব্যাঘ্র প্রায়ই বিড়ালের কৌশল অবলম্বন করে। আক্রমণ করিয়াই ইহারা শিকারের গ্রীবা মোচ্‌ড়াইয়া দেয়। ইহাতে মেরুদণ্ডের অস্থিমালার স্থানচ্যুতি ঘটিলে, অত্যন্ত বলশালী শিকারও অবশাঙ্গ হইয়া পড়ে। শিকারের সময়ে কখন কখন সম্মুখের পদযুগল দ্বারা ব্যাঘ্র আক্রান্ত প্রাণীর মস্তকে এমন গুরু আঘাত প্রদান করে যে, তাহাতে মস্তকের অস্থি একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়।

ভারতের আরণ্যভূমিতে ব্যাঘ্রের প্রচুর আধিপত্য আছে সত্য, কিন্তু বন্যবরাহ ও কুম্ভীরাদির নিকটে ব্যাঘ্রকে কখন কখন পরাভব স্বীকার করিতে দেখা যায়। বন্যবরাহগণ তীক্ষ্ণ দন্তের আঘাতে ব্যাঘ্র বধ করিয়াছে, এইপ্রকার ঘটনার কথা প্রায়ই কর্ণগোচর হয়। সুন্দরবনের বৃহৎ কুম্ভীরের সহিত যুদ্ধে ব্যাঘ্রের মৃত্যুসঙ্ঘটনও অনেক শিকারী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

পরমেশ্বর ব্যাঘ্রের দেহে যে অসাধারণ বল যোজনা করিয়া দিয়াছেন, তদনুরূপ বুদ্ধি প্রদান করেন নাই। শৃগাল-প্রভৃতি দুর্ব্বল প্রাণী ব্যাঘ্র অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন। যে বনে বহু শৃগালের বাস, সেই স্থানে সুবৃহৎ ব্যাঘ্রও বাস করিতে পারে না। শৃগালগণ দলবদ্ধ হইয়া ব্যাঘ্রকে এপ্রকার বিরক্ত করিতে আরম্ভ করে যে, শেষে বনান্তরে পলায়ন ব্যতীত তাহার মুক্তিলাভের উপায় থাকে না। অমিত বলের সহিত শৃগালের বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করিলে, ভারতবর্ষে ব্যাঘ্রের উপদ্রব সহস্রগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। সৃষ্টিরক্ষার জন্যই বিশ্বপিতা ব্যাঘ্রকে এত বলশালী করিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্পবুদ্ধি করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রশ্নাবলী।

১। ব্যাঘ্র কিপ্রকারে দুর্ব্বল প্রাণীকে বধ করে, বল। বিড়ালের সহিত ব্যাঘ্রের সাদৃশ্য কোথায়?

২। অরণ্য, প্রত্যক্ষ, শোচনীয়, শৈশব,—এই শব্দগুলি কি-প্রকারে নিষ্পন্ন হইল, বল।

৩। বিশ্বপিতা, দন্তবিন্যাস, শ্বাপদসঙ্কুল, স্বল্পবুদ্ধি,—এইগুলির সমাস কি? উহাদের সমাস-বাক্য বল।

৪। অমিত, সম্পূর্ণ, বিদেশ, বন্ধন, আয়ত্ত, দুর্লভ,—এই কয়েকটির বিপরীত অর্থবোধক এক একটি শব্দ রচনা কর।

পদ্যাংশ।

প্রার্থনা।

সকলের পিতা তুমি, তুমি সর্ব্বময়,
সর্ব্বদেশে পূজ্য তুমি সকল সময়;
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কিবা সাধু সদাশয়,
কেহবা "ঈশ্বর" "যোব" কেহ "প্রভু" কয়।

এই আশীর্ব্বাদ কর জগতের পতি,
সুপথে চলিতে যেন হয় মোর মতি।
সাধুকর্ম্ম প্রতি সদা মন যেন যায়,
কু-কর্ম্মেতে ঘৃণা হো'ক্ নরকের প্রায়।

পর দুঃখে দুঃখী হ'তে দাও উপদেশ,
ঢাকিতে পরের দোষ করহ আদেশ;
সদা যেন সেই দয়া পরেরে দেখাই,
দয়াময়! যেই দয়া চাই তব ঠাঁই!

সমুদয় স্থল হয় তোমার ভবন,
ধরা, সিন্ধু, শূন্য তব পবিত্র আসন;
করুক একত্র এরা তব গুণ গান,
রাখুক্ সকলে মিলে তোমার সম্মান!

প্রশ্নাবলী।

১। দয়া, দুঃখ, সম্মান,—এই কয়েকটি পদের বিশেষণে কি হইবে?

২। আদেশ, পূজ্য, সম্মান,—এই কয়েকটি পদের ব্যুৎপত্তি কি?

৩। এই পদ্যটিতে কবি ঈশ্বরের কি আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন?

৪। জগতের পতি, পরের দোষ,—এগুলি সমাসযুক্ত কর।

মাতৃদেবী।

মা আমার স্নেহময়ি করুণারূপিণি!
এ জগতে কোথা আছে তুলনা তোমার?
স্নেহের মূরতিরূপে আছ গো জননি,
অনুপম স্নেহ তব অনন্ত অপার!

"মা" কথা মধুর কিবা আরামদায়িনী!
রোগশয্যা'পরে কিংবা দূর পরবাসে,
উদ্দেশে "মা" বলে' আমি ডাকি গো যখনি,
শান্তি সমীরণ বহে অন্তর-আকাশে।

হইলে পীড়িত এই ভঙ্গুর শরীর,
অনাহারে অনিদ্রায় শুশ্রূষায় রত
রয়েছ মা, ঝরিয়াছে কত অশ্রুনীর,
শ্রাবণের ধারাসম হায়, অবিরত!

মহাবীর কিংবা মহাবিজ্ঞ যদি হই,
ঐশ্বর্য্যসাম্রাজ্য-আদি ভাগ্যে যদি ঘটে,
থাকিব, থাকিব আমি জানি স্নেহময়ি,
স্নেহের পুতুল সম তোমার নিকটে!

লোকমুখে শুনি' মম সুযশের বাণী,
করতলে পাও যেন পূর্ণিমার চাঁদ;
পশিলে শ্রবণে মম নিন্দা কিংবা গ্লানি,
শেলসম বিঁধে হৃদে, ঘটে পরমাদ!

এমন স্নেহের শোধ কেবা দিতে পারে?
রত্নসিংহাসনে পদ করিয়ে স্থাপন,
দিবানিশি পূজি যদি শত উপচারে,
যোগ্য প্রতিদান সেও নহে কদাচন!

প্রেমময়ী বিশ্বমাতা জগতজননী,
প্রতিনিধি তাঁর তুমি জগৎ-মাঝারে
নিঃস্বার্থ পবিত্র স্নেহে দিবসযামিনী,
তাঁর প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতেছ আমারে।

তব স্নেহে পরিব্যক্ত করুণা তাঁহার ;
গোষ্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ,
—জ্ঞানহীন অন্ধ আমি, কি বলিব আর !—
তেমতি তোমাতে মা গো তাঁহার প্রকাশ।

প্রশ্নাবলী।

১। শান্তি-সমীরণ, অন্তর-আকাশ, মহাবীর, দিবানিশি,—এই-গুলির সমাস কি ? ব্যাস-বাক্য বল।

২। করুণারূপিণী,—এই শব্দটিকে পুংলিঙ্গে পরিবর্ত্তন কর।

৩। "তব স্নেহে......আকাশ," এই দুই ছত্রের ভাবার্থ সহজ ভাষায় প্রকাশ কর। গোষ্পদ,—ইহার অর্থ কি ?

প্রতিনিধি।

বসিয়া প্রভাতকালে, সেতারার দুর্গভালে
শিবাজী হেরিলা এক দিন—
রামদাস গুরু তাঁর ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার,
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।
ভাবিলা,—"একি এ কাণ্ড, গুরুজীর ভিক্ষাভাণ্ড,
ঘরে যাঁর নাই দৈন্য-লেশ ;
সবই যাঁর হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত
তাঁরো নাই বাসনার শেষ!

এ কেবল দিনরাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে,
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে!"
কহিলা—"দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে,
ভিক্ষা-ঝুলি ভরে একবারে!"
তখন লেখনী আনি, কি লিখি দিলা, কি জানি,
বালাজীরে* কহিলা ডাকা'য়ে,
—"গুরু যবে ভিক্ষা-আশে আসিবেন দুর্গপাশে,
এই লিপি দিয়ো তাঁর পায়ে!"

গুরু চ'লেছেন গেয়ে, সম্মুখে চ'লেছে ধেয়ে
কত পান্থ কত অশ্ব-রথ!—
"হে ভবেশ! হে শঙ্কর! সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ!
অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার,
সুখে আছে সর্ব্ব চরাচর,
মোরে তুমি, হে ভিখারী! মার কাছ হ'তে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর!"

সমাপন করি গান, সারিয়া মধ্যাহ্নস্নান,
দুর্গদ্বারে আসিলা যখন,
বালাজী নমিয়া তাঁরে, দাঁড়াইল এক ধারে
পদমূলে রাখিয়া লিখন।

* শিবাজীর মন্ত্রীর নাম বালাজী।

গুরু কৌতূহলভরে তুলিয়া লইয়া করে
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি,—
বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজী সঁপিছে অদ্য
তাঁর নিজ রাজ্য রাজধানী।

পর দিন রামদাস গেলেন রাজার পাশ,
কহিলেন—"পুত্র, কহ শুনি,
রাজ্য যদি মোরে দেবে কি কাজে লাগিবে এবে ;
কোন্ গুণ আছে তব, গুণি !"
"তোমার দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান"—
শিবাজী কহিলা নমি তাঁরে।
গুরু কহে—"এই ঝুলি লহ তব স্কন্ধে তুলি,
চল আজি ভিক্ষা করিবারে !"

শিবাজী গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে হাতে
ফিরিলেন পুরদ্বারে দ্বারে।
নৃপে হেরি ছেলে মেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে,
ডেকে আনে পিতারে মাতারে।
অতুল ঐশ্বর্য্যে রত, তাঁর ভিখারীর ব্রত !
এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা !
ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে, হস্ত কাঁপে থরথরে,
ভাবে—ইহা মহতের লীলা !

দুর্গে দ্বিপ্রহর বাজে, ক্ষান্ত দিয়া কর্ম্ম কাজে
বিশ্রাম করিছে পুরবাসী।
একতারে দিয়া তান রামদাস গায় গান
আনন্দে নয়ন-জলে ভাসি,—
"ওহে ত্রিভুবনপতি! বুঝি না তোমার মতি,
কিছু ত অভাব তব নাহি,
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির, প্রভু!
সবার সর্ব্বস্বধন চাহি!"
অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যা-স্নান সারি,
ভিক্ষা-অন্ন রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলে মুখে
প্রসাদ পাইল শিষ্য তারি!
রাজা তবে কহে হাসি,— "নৃপতির গর্ব্ব নাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক;
প্রস্তুত রয়েছে দাস, আর কিবা অভিলাষ,
গুরু-কাছে লবে গুরু দুখ!"

গুরু কহে—"তবে শোন, করিলে কঠিন পণ,
অনুরূপ নিতে হবে ভার;
এই আমি দিনু ক'য়ে— মোর নামে মোর হ'য়ে
রাজ্য তুমি লহ পুনর্ব্বার!

তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ;
পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেন তাহা মোর কর্ম্ম,
রাজ্য ল'য়ে র'বে রাজ্যহীন !
বৎস ! তবে এই লহ মোর আশীর্ব্বাদ সহ
আমার গৈরিক-গাত্রবাস ;
বৈরাগীর উত্তরীয়— পতাকা করিয়া নিয়ো !"—
কহিলেন গুরু রামদাস !
নৃপশিষ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।
থামিল রাখাল-বেণু, গোঠে ফিরে যায় ধেনু,
পর পারে সূর্য্য গেল পাটে।

পূরবীতে ধরি তান, একমনে রচি গান
গাহিতে লাগিলা রামদাস ;—
"আমারে রাজার সাজে বসা'য়ে সংসার-মাঝে,
কে তুমি আড়ালে কর বাস ?
হে রাজা ! রেখেছি আনি তোমারই পাদুকাখানি,
আমি থাকি পাদ-পীঠ-তলে,
সন্ধ্যা হ'য়ে এল অই, আর কত বসে' রই !
তব রাজ্যে তুমি এস চলে' !"

প্রশ্নাবলী।

১। নিম্নের শব্দগুলির অর্থ বল—ভাল, কৌতূহল, লীলা, গৈরিক, উত্তরীয়।

২। কঠিন, পুর, শিলা, গুরু, গিরি, ঈশ্বর, পথ,—এই শব্দগুলিতে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে এবং বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত কর।

৩। কবিতার গল্পাংশ সহজ গদ্যে প্রকাশ কর।

৪। 'দাসত্ব' কিপ্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে?

৫। দুর্গের দ্বার, ঐশ্বর্য্যে রত,—এই গুলিকে সমস্ত-পদে প্রকাশ কর।

মৃত্যুর প্রতি ধার্ম্মিকের উক্তি।

ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন
অনিত্যসংসার-প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ;
যারা এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে
চিরবাসস্থান ব'লে ভাবে মনে মনে;
পাপরূপ পিশাচ যাদের হৃদাসন
করি আত্ম-অধিকার আছে অনুক্ষণ;

পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয়,
পরমেশ-প্রেমে মন মুগ্ধ যার নয়;
হেরিলে নয়নে ওই ভ্রূকুটি তোমার,
তাহাদের হয় মনে ভয়ের সঞ্চার।
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার,
ভ্রূভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তা'র ?
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস, সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন।
যে অম্লান কুসুমের মধুপান-তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মনমধুকরে,
যে নিত্য-উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তাহার তুমি সরণি* নিশ্চিত;
কোনরূপে তোমায় করিলে অতিক্রম.
যাইব আনন্দে যথা সেই প্রিয়তম।

প্রশ্নাবলী।

১। মনমধুকর, হৃদয়াসন,—এই দুইটি শব্দের সমাস কি ? তাহাদের সমাস-বাক্য বল।

২। কিপ্রকার ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করে ?

৩। অতিক্রম, আসক্ত, বিরাজিত, এগুলি কিপ্রকারে নিষ্পন্ন হইল ?

---

* পথ।

প্রকৃতির শোভা।

একদা নিদাঘকালে নিশীথ-সময়,
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয়।
হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে,
চলিলাম বাহিরেতে সমীর-সেবনে।
প্রকৃতির বিচিত্রতা করি দরশন,
ডুবিল বিমল সুখ-সিন্ধু-জলে মন।

উত্তালতরঙ্গময়-সাগরসমান,
কোলাহলপূর্ণ ছিল যেই জনস্থান!
নির্ব্বাত-তড়াগ-সম হ'য়েছে এখন,
স্তব্ধীভূত সুগম্ভীর শান্ত-দরশন।
তরু'পরে ঝিল্লী শুধু ঝিঁ ঝিঁ রব করে,
সুধার সু-ধারা ঢালে শ্রবণবিবরে।
ভুবনব্যাপিনী চারু চন্দ্রিকার ভাস,
বোধ হয় প্রকৃতির আস্য-ভরা হাস।
মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চরে।
যেন নড়ে তালবৃন্ত প্রকৃতির করে।

টুপ্ টাপ্ পড়িছে শিশিরবিন্দু-চয়,
প্রকৃতির সুখ-অশ্রু অনুভূত হয়।
চেয়ে দেখি নিরমল সুনীল আকাশে,
সমুজ্জ্বল অগণন তারকা বিকাশে!
যেন নীলচন্দ্রাতপ ঝক্ ঝক্ জ্বলে,
হীরকের কাজ তায় করা সুকৌশলে!

অনন্তর প্রমোদ-অন্তরে ধীরে ধীরে,
উপনীত হইলাম তটিনীর তীরে।
বিকসিত-কামিনীকুসুম-তরুতলে,
বসিলাম চিন্তাসখী সহ কুতূহলে।
মনোরমা সে তটিনী নয়ন-রঞ্জিনী,
নিরমল-নীরময়ী মৃদুলগামিনী।
মন্দ-মন্দ-বায়ু-ভরে মন্দ মন্দ হেলে,
বিধুর উজ্জ্বল আভা তা'র হৃদে খেলে!
কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল,
কি ছার বংশীর ধ্বনি নহে তা'র তুল!
আম জাম নারিকেল গুবাক তেঁতুল,
নানাজাতি তরুদলে শোভে দুই কূল;
শশি-করে তাহাদের স্নেহময় কায়,
মরি কি আশ্চর্য্য শোভা ধরিয়াছে হায়!

কোথাও বাঁশের ঝাড় বাঁকিয়া পড়েছে,
কোথাও তেঁতুল-ডাল হেলিয়া রয়েছে ;
শোভিছে তাদের ছায়া সলিল-ভিতরে,
ক্ষণে স্থির, ক্ষণে দোলে সমীরণভরে।
সারি সারি তরণী দু-ধারে শোভা পায়,
দাঁড়ি মাঝি আরোহীরা সুখে নিদ্রা যায় ;
কেহ বা জাগিয়া আছে তস্করের ডরে,
কেহ বা গাইছে গীত গুন্ গুন্ স্বরে।

এইরূপে প্রকৃতির রূপ-দরশনে
অহো! কি বিমল সুখ উপজিল মনে!
শিহরিল কলেবর পুলকে পূরিল,
আনন্দাশ্রু অপাঙ্গেতে উদিত হইল।
মনে মনে কহিলাম—অতি সুপ্রকৃতে!
শোভনে! বিচিত্র-চারু-ভূষণ-ভূষিতে!
মরি মরি কিবা তব মোহিনী মূরতি,
নিরখি নয়নে হ'ল জড়প্রায় মতি!
অপরূপ তব রূপ একরূপ নয়,
নব নব রূপ ধর সময় সময়।

যখন প্রাবৃট্কালে জলদের দল,
নিয়ত ঢাকিয়া থাকে গগনমণ্ডল ;

ঝম্ ঝম্ রবে হর্ষে বর্ষে নব নীর,
মাঝে মাঝে ভীম-রবে গরজে গভীর ;
থেকে থেকে জ্যোতির্ম্ময়ী চপলা চমকে,
ভুবন উজ্জ্বল করে রূপের ঠমকে ;
কদম্বকেতকী-আদি কুসুমনিকরে
ফুটিয়া কানন-কায় অলঙ্কৃত করে ;
তখন তোমার চারুরূপ-দরশনে,
বল বল নাহি হয় মুগ্ধ কোন্ জনে ।

সুখময় ঋতুনাথ বসন্তে যখন,
নব-পরিচ্ছদে কর তনু আচ্ছাদন ;
ফুল্ল ফুল দূর্ব্বাদল চারু আভরণে
সাজাও আপন অঙ্গ সহাস্যবদনে ;
বিহঙ্গ-নিনাদচ্ছলে গাও সুললিত,
তখন না হয় কার মানস মোহিত !

এইরূপ যে সময় যেই রূপ ধর,
তা'তেই তখন ভব-জন-মন হর ।
সাধে কি গো কত মহা-মহা কবিবর
উপেক্ষিয়া নগরের শোভা মনোহর,
গভীর অরণ্য ঘন শ্যামল প্রান্তরে,
ভীষণ বিজন গিরিশিখর গহ্বরে.

হেরিবারে তোমার এ রূপ বিমোহন,
অনুক্ষণ স্তব্ধভাবে করেন ভ্রমণ!
সাধে কি গো সুকোমল শয্যা পরিহরি,
তটিনীর তীরে তাঁরা আগমন করি,
তরুতলে ধরাসনে কুতূহলে বসি,
তব রূপ-দরশনে কাটান তামসী!
সাধে কি গো কবিদের সফল নয়ন,
তুচ্ছ ভাবে অট্টালিকা, স্তম্ভ সুশোভন,
সামান্য তরুর পাতা করি দরশন,
মুহুর্মুহু পুলকাশ্রু করে বরিষণ!

ধিক্ সে মানবগণে ধিক্ ধিক্ ধিক্!
তোমা চেয়ে শিল্পে যারা বাখানে অধিক,
হেরিতে কৃত্রিম শোভা ব্যগ্রচিত্তে ধায়,
তোমার সৌন্দর্য্য-পানে ফিরিয়া না চায়!
উদ্যান বিপিন গিরি করিয়া ভ্রমণ,
তোমার বিচিত্র রূপ হেরে না কখন;
বনবাসী বিহঙ্গের মধুময় গান,
শ্রবণ করিয়া কভু না জুড়ায় প্রাণ;
বিফল তাদের জন্ম বিফল জীবন,
কখন না দেখে তা'রা সুখের বদন।

ধন্য ধন্য সেই সুচতুর শিল্পকর,
যে রচিল তোমার এ তনু মনোহর!
বিচিত্র কৌশল তাঁর অনন্ত শকতি,
বারেক ভাবিলে হয় অবসন্না মতি।
বল গো শোভনে! অয়ি প্রকৃতি-সুন্দরি!
কে রচিল তোমার এ কান্তি সুখকরী?
কোথা সেই রচয়িতা সর্ব্বগুণাধার?
কোথা গেলে পাব আমি দরশন তাঁর?

প্রশ্নাবলী।

১। পুলকাশ্রু, উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময়, নিনাদচ্ছলে,—এই কয়েকটি শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কর এবং যে যে নিয়মে সন্ধি হইয়াছে, তাহার উল্লেখ কর।

২। অপাঙ্গ, তামসী, ঋতুনাথ, প্রাবৃট্‌কাল, কান্তি, বিপিন,—এইগুলির অর্থ কি?

৩। নয়নরঞ্জিনী, মৃদুলগামিনী, সুখকরী, বনবাসী,—এইগুলির লিঙ্গ পরিবর্ত্তন কর।

সালেহ রাজার কথা।

(সাদির বুঁস্তা হইতে)

তুরস্ক দেশে প্রতাপান্বিত সালে' নামে নরপতি ;
হর্ম্ম্যশোভন রাজধানী তাঁর নয়নাভিরাম অতি।
রাজে উজ্জ্বল রতন খচিত পাষাণ-প্রাসাদ তাঁর ;
ঝালরে ঝলিত ছাদেরে ঘেরিয়া দাঁড়ায় স্তম্ভসা'র।
গোলাপজলের উৎস প্রাসাদ-কানন-কুঞ্জে মাতে,
বহয়ে তাহার সুরভি সমীর জানালাতে জানালাতে।

এত সম্পদ্‌মাঝেও রাজার চিতে নাহি কোন সুখ ;
সকালে ও সাঁঝে রাজপথ-মাঝে বোর্কায় ঢাকি মুখ—
কভু বিপণীতে কভু পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়ান একা ;
কি গ্রীষ্ম শীত, সকলি সমান—চরণ ধূলিতে মাখা।
গায়ের উপরে ঠেলিয়া পথিক পাশ দিয়া চলি যায়,
সবার সঙ্গে রাজা যান ঠেলি—ভ্রূক্ষেপ নাহি তায়!

একদা প্রভাতে মস্‌জিদে গিয়ে হেরেন হঠাৎ ভূপ,
দুজন ফকির শীতে জড়-সড় ক্লিষ্ট কাতর-রূপ ;
নগ্ন চরণ, ছিন্ন বসন, হিহি করি কাঁপে শীতে,
চেয়ে আছে কবে উদিবে সূর্য্য উৎকণ্ঠিত-চিতে।

তখনো রাতির নিকষে পড়েনি উষার সোণার রেখা,
নগর-সৌধ-স্বর্ণ-চূড়া তখনো দেয়নি দেখা!

দুজনে মিলিয়া করিছে আলাপ, রাজার কাণে তা গেল—
"এতদিন ধরি সহিলাম ক্লেশ, কি ফল তাহাতে এল?
সুখে আছে রাজা বাদ্‌শারা, তা'রা স্বর্গে ইহার পরে—
করিবে দিব্য আনন্দ ভোগ! তবে এ ধর্ম্ম তরে
এত দুঃখের কোন্ প্রয়োজন? স্বর্গ রাজাও পাবে;—
এমনি সুলভ যদি রে স্বর্গ, কে তবে সেথায় যাবে?"

"আমি তো কবর হ'তে তাহা হ'লে তুলিব না মাথা ভাই,
কি বা আসে যায় এমন স্বর্গ পাই কি বা নাহি পাই?
সত্যই বলি, স্বর্গকাননে সালেহরে যদি হেরি
পাদুকায় তা'র আরাম-কোমল মাথা দিব গুঁড়া করি!
এখনি কেমন কুসুম-পেলব শয়নে সে রাতি যাপে,
শীতের তীব্র তীক্ষ্ণ বাতাসে আমাদের প্রাণ কাঁপে!"

শুনিয়া সালেহ ফকিরবচন প্রাসাদে গেলেন ফিরি,
মনে হ'ল তাঁর, মিথ্যা ও ফাঁকি দুনিয়া-বাদ্‌শাগিরি!
তখনি বারেক হইল বাসনা সন্ন্যাসিদ্বয়ে ডাকি—
তা'দের বসায়ে রাজার আসনে বুঝান কি যে এ ফাঁকি;
সুখ সমৃদ্ধি কত যে শূন্য, বিলাসে কি হাহাকার,
কি দুর্ভাগ্য যে নরপতি তা'র অন্তরে কি যে ভার।

দূত গিয়া ত্বরা ফকির দুজনে সভায় ডাকিয়া আনে—
রতন-আসনে বসান তাঁদের নৃপতি সসম্মানে।
সুগন্ধময় সুপরিচ্ছদ পরিয়া রাজার পাশে
বসিয়া তাঁহারা স্মরি নিজ কথা মরেন বিষম ত্রাসে।
যোড়কর করি কহেন, "রাজন্, অভাজন মোরা অতি
মান্যের ছলে পরিহাস কভু সাজে কি মোদের প্রতি?"

রাজা হাসি কন, "প্রভু, পরিহাস আমারেই আমি করি;
দৈন্য যে আছে, লুকাবার লাগি রাজার এ বেশ পরি!
স্বর্গ দুখীর,—জানি ব'লে আমি ঘুরি রাজবেশ ছাড়ি;
তোমাদেরি সেবায় পা'ব যে স্বর্গ, সে স্বর্গ লবে কাড়ি?"
শুনি' লজ্জায় সন্ন্যাসীদের মুখে নাহি কথা সরে!
সুখে যে বিরাগী সেই দরবেশ, বুঝিল ইহার পরে।

প্রশ্নাবলী।

১। এই পদ্যের গল্পটি সহজ গদ্যে বিবৃত কর। ইহা পাঠ করিয়া কি শিক্ষা করিলে?

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ কি?—নয়নাভিরাম, উৎস, বিপণী, ভূপ, বিলাস, অভাজন, নিকষ।

৩। নগর-সৌধ-সুবর্ণ-চূড়া, স্বর্গকানন,—এই দুইটি পদের ব্যাস-বাক্য বল।

দশরথের প্রতি কেকয়ী।

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তা'র কভু না সম্ভবে।—
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতিগৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী,
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারীব্রজ
মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়িকা ?
কেন এত বীণাধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি—

কৃপা করি কহ মোরে ;—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধনজাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘটারোলে ?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?*
নিরন্তর জনস্রোত কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘুকুলবধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু !
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘুকুলরথী ?
  হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি ;
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—অসত্যবাদী রঘুকুলপতি,
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
ধর্ম্মশব্দ মুখে, গতি অধর্ম্মের পথে !
  অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তা'র কাট তুমি আসি,
নররাজ ! কিংবা দিয়া চূণ-কালি গালে

* স্বস্ত্যয়ন—গ্রহ-শান্তির নিমিত্ত মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

খেদাও গহন বনে। যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি দেখ ভাবি মনে!

ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর—জিতেন্দ্রিয়, নিত্যসত্যপ্রিয়!
তবে কেন কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজপদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে? কোথা পুত্র তব
ভরত ভারত-রত্ন, রঘুচূড়ামণি?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী?

তিন রাণী তব, রাজা, এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে? পুত্র তব চারি, নরমণি,
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইল মন তব? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূর্ণিতে তা'র রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি?

কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে?
যাহা ইচ্ছা কর দেব; কার সাধ্য রোধে

তোমায়, নরেন্দ্র তুমি? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বিতংসে * কে বা বাঁধে কেশরীরে?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ পুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী। দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব;—যেখানে যাব, কহিব সেখানে,—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা কব সর্ব্বজনে।
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তা'র কাছে,—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গশৃঙ্গদেহে।
রচি গাথা শিখাইব পল্লীবালদলে;
করতালি দিয়া তা'রা গাহিবে নাচিয়া—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে
নিরাশ করিলে আজি;—দেখিব নয়নে
তব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি!

---

* বিতংস—পক্ষিবন্ধন-রজ্জু।

প্রশ্নাবলী।

১। রঘুকুলপতি, পল্লীবালদল, নৃমণি, অধর্ম্মাচারী,—এই পদগুলির অর্থ বল,—সমাস উল্লেখ করিয়া সমাস-বাক্য বল।

২। কেকয়ী যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া দশরথকে ভৎর্সনা করিলেন, তাহার মধ্যে একটি সহজ গদ্যে প্রকাশ কর।

৩। যাহা যথার্থ নয়, সত্যই যাহার প্রিয়, যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে, রঘুর পুত্র, নীচ কুল হইতে উদ্ভব,—এই কয়েকটিকে এক একটি শব্দে পরিণত কর।

৪। বিতরেন, ত্যজিয়া, বাহিরায়, পূর্ণিতে,—এই কয়েকটি শব্দকে গদ্যে ব্যবহার করিতে হইলে কিপ্রকারে রূপান্তরিত করিতে হইবে?